দাম : দশ টাকা

টেট কেলেঙ্কারি : দু'লাখ দিতেই হবে বাকিটা বার্গেনিং — পৃঃ ১৪

স্বস্তিকা

হে ভৈরব, শক্তি দাও ভক্ত পানে চাহো — পৃঃ ২২

৬৯ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা।। ২০ মার্চ ২০১৭।। ৬ চৈত্র - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

রাম নামে তোবা : পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বইপত্রে মুসলমান তোষণ : অচিন্ত্য বিশ্বাস — পৃঃ ১২

বাংলা ভাষার ইসলামিকরণ : মিথ্যেকারের ভগবান : প্রবাল চক্রবর্তী — পৃঃ ১৯

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ২৮ সংখ্যা, ৬ চৈত্র, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

২০ মার্চ - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ■ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ■ ৬-৯

পরিবারতন্ত্রের কফিনে পেরেক মেরেছেন উত্তরপ্রদেশের মানুষ ■ গূঢ়পুরুষ ■ ১০

খোলা চিঠি : শুধু ভোটে জেতেননি 'হাঙর' মেরেছেন মোদী ■ সুন্দর মৌলিক ■ ১১

রাম-নামে তোবা : পশ্চিমবঙ্গে সরকারি বইপত্রে মুসলমান তোষণ ■ অচিন্ত্য বিশ্বাস ■ ১২

টেট কেলেঙ্কারি : দু'লাখ দিতেই হবে, বাকিটা বার্গেনিং ■ সাধন কুমার পাল ■ ১৪

হলদিঘাটের যুদ্ধে ঐতিহাসিকতায় মহারাণা প্রতাপ ■ সৌমেন নিয়োগী ■ ১৬

মিথ্যেকারের ভগবান ■ প্রবাল চক্রবর্তী ■ ১৯

হে ভৈরব, শক্তি দাও ভক্তপানে চাহো ■ অমিতাভ সেন ■ ২২

'দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলি আই আই টির কাছে অনেক কিছুই শিখতে পারে ■ চেতন ভগত ■ ২৭

রাজা তোড়রমল্ল ■ দেবপ্রসাদ মজুমদার ■ ৩১

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত ■ সলিল গেঁউলি ■ ৩৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ২৯-৩০ ■ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** ■ **অঙ্গনা : ৩৪** ■ **অন্যরকম : ৩৬** ■ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** ■ **সমাবেশ-সমাচার : ২৪-২৬** ■ **খেলা : ৩৭** ■ **শব্দরূপ : ৪০** ■ **চিত্রকথা : ৪১** ■

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিজেপির ঐতিহাসিক জয়

সম্প্রতি পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয় পেল বিজেপি। এই জয়যাত্রার অন্তর্নিহিত কারণ ও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই সংখ্যাটিতে।

নববর্ষ সংখ্যা

স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর ভবিষ্যৎ

আগামী ১৭ এপ্রিল প্রকাশিত হবে

মূল্য একই থাকছে— ১০ টাকা

সত্বর কপি বুক করুন

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,

বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ঐতিহাসিক জয়, বিরাট দায়িত্ব

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে বিজেপি ঝঞ্ঝাবর্তে কার্যত উড়িয়া যাইল বিরোধী পক্ষ। ব্যতিক্রম কেবল পঞ্জাব। উত্তরপ্রদেশে বিজেপি ৩২৫ ও উত্তরাখণ্ডে ৫৭টি আসন দখল করিয়াছে। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল উত্তরপ্রদেশ যেখানে বিজেপি বিরোধী দলগুলিকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। আর এই বিপুল বিজয়ের শ্রেয় অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা এবং এই জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে রচিত অমিত শাহ-র রণনীতি। বিজেপির এই জয়লাভের ফলে বিরোধী দলগুলি নিষ্প্রভ হইয়া যাইল শুধু নয়, আগামী লোকসভা নির্বাচনে জয়ের পথটিও বিজেপির পক্ষে অনেকটাই সুগম হইয়া গেল এবং একই সঙ্গে রাজ্যসভার বিরোধী দলগুলির মোকাবিলাও সহজ হইল। রাজ্যসভার বিরোধী দলগুলি এযাবৎ নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ লইয়া প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছিল যে দেশের মানুষ ২০১৪ সালে যে ভুল করিয়াছে তাহা সংশোধনের দায়িত্ব তাহাদেরই। এই ভাবনা যে কতটা নেতিবাচক এই নির্বাচনের ফলে তাহা স্পষ্ট।

মণিপুরেও বিজেপি এক বড় দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যেখানে কংগ্রেস পাইয়াছে ৩৫.১ শতাংশ, সেখানে বিজেপি পাইয়াছে ৩৬.৩ শতাংশ ভোট। ইহা প্রধানমন্ত্রীর লোকপ্রিয়তারই স্বীকৃতি। মোদী-গরিমাই বিজেপির হাতে এখন সর্বাপেক্ষা বড়ো তুরুপের তাস। এই নির্বাচনে যে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হইয়াছে তাহার একটি হইল—বিজেপি আজ প্রকৃত অর্থেই সর্বভারতীয় দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। ভারতে এখন এমন কোনো গ্রাম নাই, যেখানে অন্তত জনাদুয়েক বিজেপি সমর্থকের দেখা মিলিবে না। ভারতের ১৫টি রাজ্য এখন বিজেপি ও তার জোটসঙ্গী শাসিত। 'টিনা ফ্যাক্টর' বা নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক ভোটেই। দ্বিতীয়ত, মানুষের রায় আজ জাতীয় দলের পক্ষে। ভারতের মানুষ ক্রমে আঞ্চলিক দলগুলির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয়ত, প্রধান বিরোধীদল কংগ্রেস যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে অস্তিত্বের সঙ্কটের মুখোমুখি। পঞ্জাবে যেখানে ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং-এর নেতৃত্বে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া সরকার গঠন করিতেছে, উত্তরপ্রদেশে রাহুলের নেতৃত্বে সেখানে কংগ্রেসের ঝুলিতে মাত্র ৭টি আসন। বিজেপির এই ধারবাহিক সাফল্যে ইহা স্পষ্ট যে সেকুলারিজম-এর স্লোগানটি এখন তোষণের রাজনীতির এবং সামাজিক ন্যায়-এর অর্থে জাতের নামে বজ্জাতি হিসাবে মানুষ দেখিতেছেন। এমনকী, মুসলমান সমাজের মানসিকতার সামান্য হইলেও পরিবর্তনটি লক্ষণীয়। উত্তরপ্রদেশে প্রায় দশ শতাংশ মুসলমান ভোট পাইয়াছে বিজেপি। আর যে বিমুদ্রীকরণের বিষয়টি লইয়া বিরোধী পক্ষ প্রবল সমালোচনা করিয়াছিল আম-জনতা তাহাকে ধর্তব্যের মধ্যেই গ্রহণ করে নাই।

এই ঐতিহাসিক জয়ের ভাগীদার করিয়া দেশের মানুষ যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়িয়া দিয়াছে, এখন বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাহার মোকাবিলা করিতে হইবে। আশার কথা হইল, প্রধানমন্ত্রী এই জয়ে তুষ্ট না হইয়া দলীয় কর্মী-সমর্থকদের আরও কঠিন লড়াইয়ের বার্তা দিয়াছেন। ফলভারে নত বৃক্ষের মতো বিনম্র হইতে বলিয়াছেন। 'এটাই বিজেপির স্বর্ণযুগ' আখ্যা দিয়া স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ২০২২ সালের মধ্যে দেশের মানুষকে, বিশেষত যুবসমাজকে 'নতুন ভারত' গড়িবার ডাক দিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রীর ডাকে দেশবাসী যেমন সাড়া দিতেছেন, আগামী দিনেও তাহাই করিবেন—এই আশা তাই অমূলক নয়।

সুভাষিতম্

ন দেবাঃ দণ্ডমাদায় রক্ষন্তি পশুপালবৎ।

য়ন্তুরক্ষতুমিচ্ছন্তি বুদ্ধ্যা সংযোজয়ন্তি তম্।। (মহাভারত)

পশু পালকদের মতো দেবতারা লাঠি দিয়ে কাকেও রক্ষা করেন না। যাকে রক্ষা করবেন বলে মনে করেন, তাকে সেইরকম বুদ্ধি জোগান দিয়ে রক্ষা করেন।

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়জয়কার

তোষণ-রাজনীতির মিথ ভাঙল উত্তরপ্রদেশ

পরমেশ্বর রায়॥ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে বিজেপি ঝড়ে কার্যত উড়ে গেল সমাজবাদী পার্টি বহুজন পার্টি-সহ রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস। উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে ৮০ শতাংশের বেশি আসন দখল করে বিজেপি এখন অপ্রতিরোধ্য। সুদূর উত্তর পূর্বের মণিপুরে বিজেপি জোট মুখ্যমন্ত্রীপদের দাবি পেশ করে। গোয়াতে আশানুরূপ ফল না করলেও দুই ছোট দল প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পারিক্করকে মুখ্যমন্ত্রী করার শর্তে বিজেপি জোটে শামিল হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। পঞ্জাবে কংগ্রেস জিতলেও তা নিয়ে বেশি নাচানাচি করতে অরাজি আকবর রোডের বাসিন্দারা। কারণ সেক্ষেত্রে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠে আসবে। পুরোনো কংগ্রেসিরাও পঞ্জাবের জিতকে ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং-এর ব্যক্তিগত কারিশমা ও আকালিদের বিরুদ্ধে দশ বছরের শাসক বিরোধী হাওয়াকেই দায়ী করেছে। নির্বাচনী কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করতাম না।

নির্বাচনে বিজেপির বিশাল জয় ভারতীয় গণতন্ত্রকেই পুষ্ট করল বলে বিশেষজ্ঞদের মত। কেউ কেউ বিজেপির এই ঐতিহাসিক জয়কে ভারতীয় গণতন্ত্রের সাবালকত্ব প্রাপ্তি হিসেবেও দেখছে। প্রথমবার সংখ্যালঘুবাদ, জাতিবাদ, আঞ্চলিকতা ভুলে মানুষ একজোট হয়ে ভোট দিয়েছে, যা এক কথায় বেনজির।

অনেক সামাজিক বিশ্লেষক এই জয়কে জাতীয়তাবাদী হিন্দুত্বের জয় বলেও দেখছে। বিরোধী দলগুলি যেভাবে জেহাদি মুসলমান নেতৃত্বকে তোয়াজ করে চলেছে মানুষ মন খুলে তার বিরুদ্ধে নেমেছে বলে একদল নির্বাচনী বিশেষজ্ঞদের মত। কেউ কেউ এই জয়কে সাম্প্রদায়িক, জেহাদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহনশীল, প্রগতিশীল মুসলমানদের নীরব প্রতিবাদ হিসেবে দেখছেন। উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যার ১৯ শতাংশ মুসলমান। ১১৯টি আসনের জয় পরাজয়

ঘোষণার পূর্ব মুহূর্ত থেকেই দেখা গিয়েছে পূর্ব-মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন সাহেব পঞ্জাবের প্রচার প্রায় একা হাতে সামলেছেন। কংগ্রেস হাইকমান্ডও পঞ্জাব নিয়ে বেশি নাক গলানোর সাহস দেখায়নি, সেক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন সাহেবের নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার গুঞ্জনও শোনা গেছে। ফলে পঞ্জাব নিয়ে নাচানাচি মানে ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং-এর পঞ্জাবে বিরাট জয় (১২১ আসনের মধ্যে ৭৭ আসনে জয়) সঙ্গে রাহুল গান্ধীর উত্তরপ্রদেশে বিরাট পরাজয়ের (৪০৩ আসনে মাত্র ৭টিতে জয়) তুলনা চলে আসতে বাধ্য। কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা গুলামনবি আজাদ ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই গেয়ে রেখেছেন এ পরাজয় কংগ্রেসের পরাজয় রাহুলের নয় কারণ আমরা উত্তরপ্রদেশে ‘‘ছোট দল’’। অখিলেশ প্রতাপ আগেই বলেছেন পরিবারে কোঁদল না হলে অনেকটাই মুসলমান ভোটের ওপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান প্রার্থী দাঁড় না করিয়ে ৪০৩টি আসনের মধ্যে ৩২৫টি-তে জয়লাভ করেছে বিজেপি। সেখানেও বিজেপির আসন সংখ্যা ৩৮। এবারের বিধানসভায় মুসলমান বিধায়কদের সংখ্যা গতবারের তুলনায় কমছে প্রায় ৩০০ শতাংশ। গতবারের ৬৯ থেকে কমে হয়েছে ২৪। এর মধ্যে সমাজবাদী পার্টির ১৬ জন, বহুজন সমাজপার্টির ৫ জন ও কংগ্রের মাত্র ২ জন। উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশ ভোটে বিজেপি একজনও মুসলমান প্রার্থী নামায়নি। ফলে নতুন শাসক জোটে মুসলমান বিধায়ক অমিল। অল ইন্ডিয়া মুসলিম উইমেন পারসোনাল ল বোর্ড-এর সভাপতি সায়িস্থা অম্বর বলেন, ‘তিন তালাক নিয়ে বিজেপির অবস্থানের জন্য মুসলমান মহিলারা বিজেপিকে সমর্থন জানিয়েছে, না হলে বিজেপির পক্ষে এত ভাল ফল করা অসম্ভব ছিল।’ কানপুরের সেন্টার ফর দি স্টাডি অফ সোসাইটি অ্যান্ড পলিটিক্স এর বিশেষজ্ঞ এ কে ভার্মাও শ্রীমতী সায়িস্থা অম্বরকে সমর্থন করে জানিয়েছেন, ‘‘আশ্চর্য হয়ে দেখছি আমাদের সার্ভেতে মুসলমান যুবসমাজ বিশেষ করে মহিলারা খোলাখুলি বিজেপির সমর্থনে মুখ খুলেছে কারণ তিন তালাক। তাদের বক্তব্য বিজেপি তিন তালাক বন্ধ করতে পারবে যা অন্যরা কখনই করবে না।’’

উত্তরপ্রদেশের দেওবন্দ বিধানসভা আসন যেখানে ৬৫ শতাংশ ভোটার মুসলমান সেখানেও বিজেপি প্রার্থী ব্রিজেস কুমার প্রায় ৩০,০০০ ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সেন্টার ফর স্টাডি অফ ডেভেলপিং

সোসাইটি ইন উত্তরপ্রদেশের কো-অডিনেটর অসমের বেগ বলেন, "এটা বোঝাই যাচ্ছে মুসলমানরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছে আর এতে আশ্চর্যের কী আছে ২০১৪ লোকসভা ভোটেও ১০ শতাংশ মুসলমান বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল।"

কয়েকজন বিশেষজ্ঞ একে হিন্দুত্বের জাগরণ হিসেবেও সজ্ঞায়িত করেছে। যেভাবে উত্তরপ্রদেশের মতো জাতপাত বিভাজিত রাজ্যে বিজেপি ৪০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে জিতেছে তাতে এটা নিশ্চিত মানুষ জাতের উর্ধ্বে উঠে ভোট দিয়েছে। স্বঘোষিত দলিত পার্টি বহুজনসমাজ পার্টি মোট ৮৫টি সংরক্ষিত আসনে মাত্র ২টিতে জয়ী হয়েছে। বেশির ভাগটাই গেছে বিজেপির ঝুলিতে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বহুজন সমাজ পার্টির এক পুরোনো নেতার কথায়, "মায়াবতী মাত্র ৮৭ জন দলিত, আদিবাসী প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিলেন যার ৮৫টি আসন সংরক্ষিত, সেখানে মুসলমান প্রার্থী দিয়েছিলেন প্রায় ১০০ জন। এই চালাকি দলিত সমাজ মেনে নেয়নি। দলিতের উন্নতির কথা বলেও তাদের উদ্দেশ্য হিন্দু সমাজের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে ক্ষমতা দখল, দলিত সমাজকে মূল হিন্দুসমাজে সমাহিত করা নয়। যে ভাবে বিজেপি জাতপাতের উর্ধ্বে উঠে যোগ্য নেতৃত্বকে সম্মান দেয় তা অন্য দলে অমিল।" এই বক্তব্যকে অনেক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরাই সমর্থন জানিয়েছেন। পিছিয়ে পড়া হিন্দু জনগোষ্ঠী থেকে নেতৃত্ব তুলে আনা হচ্ছে তাও এক কথায় বেনজির। আর এস এস-এর বিরাট হিন্দু সমাজের কল্পনারই রূপ দিচ্ছে বিজেপি দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বলে বিশেষজ্ঞদের মত। 'যেখানে সমস্ত হিন্দুই ভ্রাতৃত্ববোধে জড়িত।'

উত্তরপূর্বের মণিপুরেও ৩৬.৩ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপি সর্বাধিক জনপ্রিয় দল যদিও তার আসন সংখ্যা ২১। কংগ্রেস পেয়েছে ৩৫.১ শতাংশ ভোট। এই রাজ্যে সরকার গড়তে সক্রিয় বিজেপি জোট। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী মণিপুরের একমাত্র তৃণমূল বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছে বলে গুঞ্জন।

উত্তরাখণ্ডে তো এক কথায় বিজেপির কংগ্রেসকে ভোটের ময়দানে টিকতেই দেয়নি। ৭০ আসনের বিধানসভায় ৫৭টি জিতেছে।

এই নির্বাচনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খবরের একটি— বামদলগুলি এককথায় ভারতীয় রাজনীতি থেকে বিলুপ্তির শেষ পর্যায়ে। এই ভোটে তাদের প্রাপ্ত ভোট 'নোটার' থেকেও কম।

কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ১১টি আসন। পাহাড়ি রাজ্যে কোনোক্রমে বিরোধী দলের মর্যাদা পেয়েছে তারা। এই নির্বাচনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খবরের একটি— বামদলগুলি এককথায় ভারতীয় রাজনীতি থেকে বিলুপ্তির শেষ পর্যায়ে। এই ভোটে তাদের প্রাপ্ত ভোট 'নোটার' থেকেও কম। উত্তরপ্রদেশে ০.২ শতাংশ, মণিপুরে .৭ শতাংশ, প্রাক্তন বাম প্রধান সুরজিতের পঞ্জাবে ০.২ শতাংশ নিয়েই বামপন্থীরা সন্তুষ্ট থাকছে। এই বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ৬৪ শতাংশের বেশি ভূভাগ এবং প্রায় ৬০ শতাংশ জনসংখ্যার উপর বিজেপি শাসন করছে বা করতে চলেছে। এক কথায় দেশে এখন মোদী ঝড় বইছে।

রাজ্য	মোট আসন	বিজেপি জোট	কংগ্রেস	এসপি	বিএসপি	তৃণমূল কংগ্রেস	বাম জোট	অন্যান্য
উত্তরপ্রদেশ	৪০৩	৩২৫	৭	৪৭	১৯	০	০	৫
উত্তরাখণ্ড	৭০	৫৭	১১	০	০	০	০	২
পঞ্জাব	১১৭	১৮	৭৭	০	০	০	০	২২
মণিপুর	৬০	২১	২৮	০	০	১	০	১০
গোয়া	৪০	১৩	১৮	০	০	০	০	৯

উত্তরপ্রদেশ আজ ক্ষমতালোলুপতার শ্মশানভুমি

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিধ্বস্ত, প্রায় পঙ্গু কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্বল সম্পূর্ণ অপহৃত হলেও তার ক্ষমতা লিপ্সায় যে কোনো ভাটা পড়েনি তার প্রমাণ ছিল উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদীর সঙ্গে দলের জোট। মাত্র কয়েক মাস আগেই সমাজবাদীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে 'খাটযাত্রা' করলেও উভয় দলের ভোট পাটিগণিত হিসেব করে ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট ভোগের সম্ভাবনায় কংগ্রেস এক বিষম চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। আইনের ভাষায় 'উৎস সূত্রেই অসিদ্ধ' এই চুক্তির (void abinitio) ফলাফল যে এমন ভয়াবহ হতে পারে তার বিন্দুমাত্র আঁচ অপরিণত দুই রাজনীতিকের কেউই পাননি। বিজেপি সভাপতি এই তথাকথিত 'উত্তরপ্রদেশের মন পসনদ জুড়ি' সম্পর্কে ব্যঙ্গের ছলে একটি নির্বাচনী সভায় বলেছিলেন— "এক কে লিয়ে উনকা মা বহুত দিন সে পরিসান (নাচার) হ্যায়, আউর এককে লিয়ে উনকা বাপ পরিসান হ্যায়। ইয়ে দোনো আপকা পরিসানী ক্যায়সে হাল (দূর) করেগা? ইয়ে আপলোক শোচিয়ে।"

উত্তরপ্রদেশের মানুষজন যাঁরা মোদীজীর ভাষায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় নয় হার্ড ওয়ার্ক-এ বিশ্বাসী তাঁদের এই ছলনা ধরে ফেলতে দেরি হয়নি। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে দেশকে পৈত্রিক সম্পত্তি ভেবে লুটপাট করার এমন গর্হিত যৌথ পরিকল্পনাকে তাঁরা বানচাল করেছেন। যে কংগ্রেস দল দীর্ঘকালীন দুর্নীতির অভিযোগে মাত্র কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা হারিয়েছে তারাই উত্তর প্রদেশে স্বজন পোষণ, ভূমিলুট, গণধর্ষণ, পরিবারতন্ত্রের মাধ্যমে দুর্নীতি চালানো ও মুসলমান তোষণের দায়ে জনগণের চোখে কুখ্যাতির চরম সীমায় পৌঁছন একটি দলের সঙ্গে রাজ্যের ভবিষ্যতের পক্ষে ধ্বংসাত্মক এমন একটি জোট অবলীলায় করে ফেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। এই অবৈধ চুক্তিকে বিনষ্ট করার আন্তরিক তাগিদেই তারা আগাম এক্সিট পোলগুলির রিক্টর স্কেলে অনির্ণেয় এই তীব্র নির্বাচনী প্রত্যাঘাত করেছে। যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি বলে কেন বিজেপি'র প্রার্থী তালিকায় একজনও মুসলমান প্রার্থী না থাকার গালভরা যুক্তি দিচ্ছিলেন, ফলাফলের সাফল্যই পর্যাপ্তভাবে প্রমাণ করেছে বিজেপির জনমানস সম্পর্কে অনুমান কত নির্ভুল ছিল। গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনায় যে চেক অ্যান্ড ব্যালান্স-এর কথা বলা হয় অর্থাৎ বিরোধী দল ন্যায়সঙ্গত প্রক্রিয়ায় শাসকদলের ভুলত্রুটি নির্দেশ করবে, সংশোধনের ব্যবস্থা করবে উত্তরপ্রদেশে তার ছিটেফোঁটাও ছিল না। একটি পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক প্রায় সকলেই বিধানসভা বা লোকসভা বা রাজ্যসভার সদস্য। না হলে পৌরসভা পঞ্চায়েত বা নিদেনপক্ষে সরকারি সংস্থাগুলির লোভনীয় পদে রয়েছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের গুণ্ডা শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করা এক মন্ত্রী তুমুল দাপটে হারানো মোষ পুনরুদ্ধারের জন্য পুলিশকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু কলেজে কলেজে মেয়েদের নির্যাতনে অভিযুক্ত সংখ্যালঘু যুবকরা নিশঙ্কচিত্তে বিরাজমান। উত্তরপ্রদেশবাসী এদের দেখেছে। তাদের মানসিক অবস্থার যথার্থ বিশ্লেষণ করতে পেরেছিলেন অমিত। বুদ্ধিমান বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ। তাই মুসলমান প্রার্থী দেওয়ার মতো অন্যায় তিনি আর সজ্ঞানে করতে চাননি কেননা মানুষ তাদের ঘৃণার নজরে দেখছিল। নতুন বিধানসভায় এক ধাক্কায় তাদের সংখ্যা ৬৯ থেকে ২৪-এ নেমে এসেছে। এই অবনমন সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরপ্রদেশবাসীর অভিপ্রেত ছিল। হার্ভার্ড-এর দুরভিসন্ধিপূর্ণ বিশ্লেষণ তাই মাটির বাস্তবতার কাছে অপ্রয়োজনীয়, পরাভূত। প্রতিশ্রুতিমতো খুব শিগগিরই ছাত্রীদের নিরাপত্তায় তৈরি হবে কলেজে কলেজে Anti Romeo Squad। সাংসদের ও পরিবারতন্ত্রের ঘোরটোপে থাকা শ্রীমতী ডিম্পল যাদব তরুণী মেয়েদের এই নিত্য যন্ত্রণার কোনো হদিশ পাননি। তিনি বিদ্রূপ করে বলেছিলেন— 'রোমিও বিরোধী বাহিনী' আদতে 'রোমিও জুলিয়েট বিরোধী' বাহিনী হয়ে মেয়েদের অবাধ মেলামেশার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে। সেই ঠাণ্ডা ঘরের বিশ্লেষণ— দেবীর ঘোটকে আগমন ফল মড়ক অর্থে সাইকেল পাংচার।

এমন সব নানান কামনা বাসনার ঐতিহাসিক পাংচার এই নির্বাচনে ঘটে গেছে তাঁর হদিশ পাওয়া ভার। যে হস্তী-আসীনার পদক্ষেপে রাজ্য কম্পিত হোত সেই মায়াবতী হারিয়ে গেলেন। তিনি আর আগামী পাঁচ বছর (এপ্রিল ২০১৮)-এর পর রাজ্যসভায় যেতে পারবেন না। বিপুল সংখ্যক মুসলমান প্রার্থীই পরাজিত। কে পাঠাবে? কম করে ৩১ জন দরকার। তাঁর সাকুল্যে ১৯। তবে তাঁর দূরদৃষ্টির তারিফ করতেই হবে। লক্ষ্ণৌ ও উত্তরপ্রদেশ ঘিরে তাঁর নিজ নির্মিত মর্মর মূর্তিগুলি একটু যেন অগ্রিমই তাঁর স্মৃতিরক্ষার কাজে লিপ্ত হবে। অচিরে তাঁর দলও জাতীয় দলের তকমা খোয়াবে। গহ্বরে তলিয়ে গেলেন আরও এক জন্মসূত্রে সুযোগসন্ধানী জাঠ নেতা চরণ সিং পুত্র অজিত। এই মহানুভব তাঁর বরাবরের প্রাক নির্বাচনী বক্তৃতায় তাঁর স্বজাতীয়দের (মূলত মেরঠ অঞ্চলের) লোকজনদের বলতেন— তাঁকে জেতালেই ক্ষমতায় যে বড় দলই আসুক না কেন তিনি তাদের সঙ্গে ভিড়ে মন্ত্রী হবেনই। গত বিশ বছর তাই হয়ে এসেছে। বহু ক্ষেত্রেই কেন্দ্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা হেঁচড়া হলেই সুযোগসন্ধানী অজিত সমর্থনের বিনিময়ে মন্ত্রী হয়ে গেছেন। তাঁর কুমতলব এতদূর পৌঁছেছিল যে কেন্দ্রে বর্তমান বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার পর পূর্বতন সরকারে মন্ত্রী থাকার সুবাদে যে বাড়িতে তিনি থাকতেন তা ছাড়তে হওয়ায় তিনি তাঁর কিছুকাল সমর্থনহীন প্রধানমন্ত্রী থাকা পিতা চরণ সিংহের পূর্বতন বাসভবনটিকে সংগ্রহালয় করার দাবি জানান। উদ্দেশ্য তিনিও বিলাসবহুলভাবে সেখানে থেকে যেতে পারবেন। তাঁর অভিসন্ধি সিদ্ধ হয়নি। তাঁকে বাসভবনটি ছাড়তে হয়। বর্তমান নির্বাচনে তাঁর দলটিও নিখোঁজ তালিকায়।

কত বলা যায়! ভারতের ৭০ বছর ক্ষমতাভোগী বটবৃক্ষ কংগ্রেস নির্বাচনে ৭টি আসন পেয়েছে। মাত্র দু-একটি জেলায় পরিচিত ৯টি আসন জেতা আপনাদলেরও পেছনে চলে গিয়ে ভারতের সবচেয়ে বড় রাজ্যে পঞ্চমস্থানে

থাকার বিরল গৌরব অর্জন করেছে। ভুললে চলবে না এঁরাই শীলা দীক্ষিতকে মুখ্যমন্ত্রী প্রজেক্ট করেছিল। সেই ধন্য আশা কুহকিনী তোমার মায়ায়! সবই হার্ভার্ড-এর পরাকাষ্ঠা— বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে কী বিপুল অজ্ঞতা। এমন বিচিত্র ঘটনার ঘনঘটাই উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে মোদীজীর সংহার মূর্তির অভিঘাত। হাজার মাইল অবলীলায় অতিক্রম করে তা প্রদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে এই বঙ্গেও এসে পৌঁচ্ছচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের কুলগুরুসম 'বিষাদবাজার পত্রিকাটি'র বৌদ্ধিক স্তম্ভ লেখিকা (১২-৩-২০১৭) বিজেপি সভাপতির প্রশংসায় মগ্ন। এরই নাম চিন্তাস্তরের বাধ্যতামূলক বিবর্তন। এক অভূতপূর্ব মোড় বদল— কলকাতায় রাজপথে পোস্টারগুলি এখনও টাটকা 'মোদী হঠাও দেশ বাঁচাও'। মানুষের মনের মধ্যে অভিসন্ধিমূলকভাবে গেঁথে দেওয়া দেশে ঘনায়মান দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক কতটা প্রবাহমান তার পরিমাপ হওয়াও জরুরি। এখানকার মুখ্যমন্ত্রীর অন্ধ প্রধানমন্ত্রী বিরোধিতার যে ব্যক্তিগত কারণ ছিল, সাধারণ মানুষের দুর্গতি যে নেহাতই ছলনা, উত্তরপ্রদেশের কয়েক কোটি আরও বেশি গরিব মানুষের আশীর্বাদ পেয়ে মোদীজী তা উন্মোচন করে দিয়েছেন। সাম্প্রতিক ওড়িশা, মহারাষ্ট্রের দশ দশটি পুরসভায় বিপুল জয় দেখে কিছুটা থমকে গেলেও কয়েকটি বুথ ফেরত সমীক্ষায় ত্রিশঙ্কুর গন্ধ পাওয়া মাত্রই এই সারদা নারদায় জড়িত নেতা নেত্রীদের প্রধান লক্ষ্ণৌ গিয়ে বুয়া বাবুয়ার (মায়াবতী অখিলেশের) অর্থলিপ্সু মিলনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। দেশের আর কোনো রাজনীতিবিদ এমন বদ মতলব দেখাবার ভরসা করেননি। দেশ বিরোধী মুসলমান তোষণে তাঁর সম্ভাব্য দোসরকে মন্ত্রণা দেবার সুযোগ হাতছাড়া হলো। এই বিধ্বংসী ঝঞ্ঝাবর্তের পর তিনিও অজানা আশঙ্কায় আতঙ্কিত। দেশ কিন্তু এক বহু প্রতিক্ষীত পরিবর্তনের সন্ধিলগ্নে। উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন তাঁর তোষণবাদী কু-রাজনীতিকেও অচিরে পরীক্ষার মুখে ফেলবে। জনতার অন্তর্লীন ক্ষোভ বহমান।

উবাচ

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

"উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয়ের পিছনে অমিতভাই (অমিত শাহ) থেকে শুরু করে দলের প্রতিটি কর্মীর ভূমিকা রয়েছে। বিজেপি এখন সারাবিশ্বে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দল। এই সময়কে আমাদের স্বর্ণযুগ বলা যায়।"

সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিজেপির আকাশচুম্বী সাফল্য প্রসঙ্গে।

অমিত শাহ
বিজেপির সভাপতি

"বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সাফল্যের অভিঘাত ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের থেকেও গভীর। ২০১৯-এর সাফল্য এর থেকেও বড়ো মাপের হবে।"

সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিজেপির জয় প্রসঙ্গে।

ইরফান নুরুদ্দিন
জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

"নোটবন্দির ফলে কয়েকটাদিন একটু কষ্ট হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ভারতীয়রা সিদ্ধান্তটিকে অন্তর থেকে গ্রহণ করেছেন। দুর্নীতিগ্রস্থ ধনীদের বিরুদ্ধে কেউ লড়াই করলে তাকে এভাবেই সাদরে গ্রহণ করে সাধারণ মানুষ। নরেন্দ্র মোদী সেরকমই একজন। কালোটাকার বিরুদ্ধে লড়ছেন। তার ফলও পেয়েছেন সাম্প্রতিক নির্বাচনে। ২০১৯-এর নির্বাচনেও তিনি যে ফেভারিট থাকবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

নোটবন্দি ও বিজেপির নির্বাচনে সাফল্য প্রসঙ্গে।

ওমর আবদুল্লা
জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

"সংক্ষেপে বলতে পারি, সারা ভারতে আজ গ্রহণযোগ্য কোনো নেতা নেই যিনি মোদীকে এবং ২০১৯-এ বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। এই হিসেবে ২০১৯-এর কথা ভুলে যেতে হবে আর ২০২৪-এর জন্য পরিকল্পনা বা আশা করতে হবে।"

সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গে।

পরিবারতন্ত্রের কফিনে পেরেক মেরেছেন উত্তরপ্রদেশের মানুষ

উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে ফের মোদী সুনামি। ঐতিহাসিক জনরায়ে ১৪ বছর পর ক্ষমতায় আসীন ভারতীয় জনতা পার্টি। ১৯৮০ সালের পর থেকে দেশের সবথেকে বড় রাজ্যে এমন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কোনো দল ক্ষমতায় আসেনি। এমনকী অযোধ্যায় রাম নামের ভরা জোয়ারে বিজেপি ২২১টি আসন পেয়েছিল। এবার মোদী ঝড়ে বিজেপি ৩২৫। রাহুল-অখিলেশ জোট, বহেনজি ঝড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে গেছে। এখন একটাই আওয়াজ, 'হর হর মোদী—ঘর ঘর মোদী।' বিজেপিকে যেসব রাজনীতিকরা সাম্প্রদায়িক দল বলে বিদ্রূপ করেন তাঁদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মানুষ। জাতপাত, ধর্ম, শ্মশান-কবরস্থানের বিতর্ককে খারিজ করে তাঁরা উন্নয়নকে ভোট দিয়েছেন। মুসলমান, দলিত, অনগ্রসর শ্রেণী, উচ্চবর্ণ ভোটাররা জোটবদ্ধভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা কোনো দলেরই 'ভোটব্যাঙ্ক' নন। তাঁরা রাজ্যের উন্নয়ন চান। তাঁরা মানুষ। গোরু ছাগল ভেড়া নন। মায়াবতী অখিলেশের রাজত্বে দুর্নীতির ঘুনপোকা উত্তরপ্রদেশের মানুষের জীবন দুর্বিষহ করেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়েছে সপা আর বিএসপি-র বাহুবলীরা। আর আঙুল তুলেছে বিজেপির দিকে। মুসলমান ভোটদাতারা অবশেষে ধাপ্পাবাজ প্রতারক রাজনীতিকদের চালটি বুঝেছেন এবং দু'হাত ভরে বিজেপি প্রার্থীদেরই ভোট দিয়েছেন।

উত্তরপ্রদেশের গৌতমবুদ্ধ নগর জেলার দাদরি ও সংলগ্ন জেওয়ার দুটি আসনেই এবার জয়ী হয়েছে বিজেপি। ২০১৫-র সেপ্টেম্বর মাসে গোমাংস খাওয়া ও ফ্রিজে মজুত রাখার অভিযোগে মহম্মদ আখলাক নামে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে মেরেছিল উন্মত্ত জনতা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক ইন্ধন যুগিয়েছিল সংবাদ মাধ্যম এবং এক শ্রেণীর বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা। দিনের পর দিন হিন্দু বিদ্বেষ ছড়ানো হয়। নরেন্দ্র মোদীকে দাঙ্গাবাজ প্রধানমন্ত্রী আখ্যা দিয়ে কুৎসিৎ সমালোচনা করে কংগ্রেস ও তার দোসর বামপন্থীরা। সেই অভিযুক্ত সঙ্গীত সোম এবং সুরেশ রাণাও বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়েছেন। একটা সাফ কথা উত্তরপ্রদেশের সাধারণ মানুষ দেশের সমস্ত পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতিকদের জানিয়ে দিয়েছেন যে কোনো অঞ্চল বা সম্প্রদায় তাঁদের পকেটে নেই। কিছুদিন আগেও মনে করা হোত যে আমেথি কেন্দ্রটি গান্ধী পরিবারের শক্তপোক্ত দুর্গ। হ্যাঁ, এমনই মিথ্ ছিল আমেথিকে ঘিরে। এবার প্রিয়াঙ্কা বঢরা এবং রাহুল গান্ধী এখানে টানা প্রচার চালিয়েছিলেন। লাভ হয়নি। আমেথির চারটি বিধানসভা আসনেই কংগ্রেস প্রার্থীরা পরাজিত। এই আমেথি কেন্দ্রে ধর্ষণে অভিযুক্ত অখিলেশ যাদবের গুণধর মন্ত্রী গায়ত্রী প্রজাপতি বিজেপি প্রার্থী গরিমা সিংহের কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছে। এটাই মোদী ঝড়। যে ঝড়ে উড়ে গেল নেহরু-গান্ধী পরিবারের দুর্গ আমেথি।

গূঢ় পুরুষের কলম

আক্ষরিক অর্থেই দেশের রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের কফিনে পেরেক মেরেছেন উত্তরপ্রদেশের ভোটদাতারা। এতকাল এই রাজ্যে পরিবারতন্ত্রের বাড়বাড়ন্ত ছিল খুবই। বাবার হাত ধরে ছেলে। স্বামীর ছাতার তলায় স্ত্রী। প্রথম পক্ষের ছেলে অখিলেশকে মুখ্যমন্ত্রীর কুরশিতে বসিয়ে ছিলেন সপার প্রতিষ্ঠাতা নেতাজী মুলায়ম সিং যাদব। ভাই, ভাইপো, বউমা মিলিয়ে যাদব পরিবারের পাঁচজন সাংসদ। দ্বিতীয় পক্ষের ছেলের বউ অপর্ণা যাদবকে প্রার্থী করেছিলেন সপার গড় লখনউ ক্যান্টনমেন্ট আসনে। মুলায়ম ধরেই নিয়েছিলেন তাঁর স্নেহের বউমা সহজেই জিতবেন। কিন্তু দেখা গেল বউমা হেরেছেন। আসলে বাপ ব্যাটার মারপিট, ক্ষমতার লালসার দড়ি টানাটানিতে তিতিবিরক্ত মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছেন, পরিবার নয় চাই উন্নয়ন। তাঁরা বার্তা দিয়েছেন ১০ নম্বর জনপথের বাড়িকেও। উত্তরপ্রদেশের মানুষ আর কুর্ণিশ করবে না ইন্দিরা গান্ধীর পরিবারকে। অখিলেশের সাইকেলে চড়ে চরকিপাক দিয়ে রাজ্যের মানুষকে বোকা বানাতে গিয়ে সোনিয়ার লাডলা ব্যাটা নিজে ডুবেছেন এবং কংগ্রেস দলকেও ডুবিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এবার দলের মধ্যে প্রশ্ন উঠবে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব নিয়ে। ব্যক্তিগত ক্যারিশ্মা দিয়ে যে নেতা দলকে জেতাতে পারে না তাকে চুনো পুঁটি রাজ্য নেতারাও মানতে চাইবে না। দলকে একাই জেতাতেন ইন্দিরা গান্ধী। তাই তিনি ছিলেন দলের নেত্রী। আমরা পছন্দ করি বা না করি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একক ক্যারিশ্মায় তৃণমূল দলকে জেতান। তাই তিনি দলের প্রধান নেত্রী। নরেন্দ্র মোদী ঝড় তোলেন বলেই তিনি দেশের এবং দলের নমস্য নেতা। উন্নয়নের প্রধান কাণ্ডারী।

প্রায় সব বুথফেরত সমীক্ষায় ইঙ্গিত ছিল উত্তরপ্রদেশে বিজেপি একক গরিষ্ঠতা নিয়ে বড় দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু মোদী সুনামিতে আসন সংখ্যা ৩২৫ হবে সেকথা সমীক্ষা বলতে পারেনি। যেমন, এবিপি নিউজ বলেছিল বিজেপি পাচ্ছে ১৬৪ থেকে ১৭৬টি আসন। ইন্ডিয়া টিভি দিয়েছিল ১৫৫—১৬৭। ইন্ডিয়া নিউজ ১৮৫। একমাত্র টাইমস নাও-এর সমীক্ষা বলেছিল বিজেপি পেতে পারে ১৯০—২১০। সরকার গড়ার ম্যাজিক ফিগার ছিল ২০২টি আসনে জয়। আসলে সংবাদমাধ্যমের কর্তারা জাতপাতের অঙ্ক কষতে যতটা ব্যস্ত ছিলেন পথে নেমে বাস্তব পরিস্থিতিটা ততটা বোঝার চেষ্টা করেননি। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন যে ২০১২ সালের বিধানসভার নির্বাচনের ধাঁচে এবারেও জাতপাতের হিসেবেই ভোট হবে। মুসলমানরা বিপুলভাবে বিজেপিকে ভোট দেবেন এটা তাঁরা বোঝেননি। বোঝেননি বলেই সমীক্ষা ভুল হয়েছে। জাতপাত, ধর্ম নয়। উত্তর-প্রদেশের মানুষ চেয়েছেন রাজ্যের উন্নয়ন। মুসলমান, দলিত পরিবারের ছেলেমেয়েরা জানেন বেকার বেরোজগার হয়ে থাকার জ্বালাটা কী। মোদী রাজ্যবাসীকে উন্নয়ন দেবেন এই প্রত্যাশাই তুরুপের তাস হয়ে বিজেপিকে বিপুল ভোটে জয়ী করে রাজ্যে ক্ষমতায় এনেছে। সমীক্ষা এইটি ধরতে পারেনি।

শুধু ভোটে জেতেননি 'হাঙর' মেরেছেন মোদী

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

এই চিঠি আপনাদের। কারণ, মাত্র ক'টা দিন আগে দেশ এক পরিবর্তন দেখল। উত্তরপ্রদেশে বিজেপির জয় শুধু ওই রাজ্যের নয় —এই দেশের। কারণ এমন 'বদল' আগে আসেনি।

গুজরাটের বড়ানগরের দরিদ্র পরিবারের সন্তান নরেন্দ্র মোদী। সেই বালক এক দিন সত্যি সত্যিই নদীতে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। তখন কে জানত এই ছেলেই বড় হয়ে আরও বড় জলে নামবেন। ডাঙায় তুলবেন হাঙরকে! জেনে নেওয়া যাক সেই বালকের কাহিনি। এই কাহিনি প্রধানমন্ত্রীর সব জীবনীকাররাই তাঁদের বইতে লিখেছেন। আজকের নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী নিয়মিত স্নান করতেন বড়ানগরের শর্মিষ্ঠা সরোবরে। লোকে বলত ওই সরোবরে অনেক কুমির রয়েছে। কিন্তু সেই সব সাবধানবাণীকে পাত্তা না দিয়েই শর্মিষ্ঠা সরোবরে নিয়মিত এপার-ওপার করত বালক নরেন্দ্র।

তখন তিনি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। একদিন সাঁতরে পারে ওঠার পরে দেখা যায় তাঁর হাতে একটা ছোট কুমির ছানা। সকলে চিৎকার করে উঠেছিল— 'ফেলে দে ফেলে দে।' ফেলেও দিয়েছিলেন সবার কথা শুনে। পরে নাকি নরেন্দ্র বলেছিলেন, 'মগর মাছ মানে যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার, সেটা বুঝতে পারিনি।' যে কাহিনি শোনা যায়, তাতে ওই সরোবরের মাঝখানে ছিল একটি কৃষ্ণ মন্দির। প্রবল বৃষ্টিতে সেবার গোটা মন্দিরটাই জলের নীচে চলে যায়। এমনকী, তার চূড়ায় যে গেরুয়া পতাকা ছিল সেটাও জলে ভেসে যায়। নিয়ম ছিল, সেই পতাকা বছরের একটি বিশেষ দিনে বদলাতে হবে। কিন্তু সেই পতাকা ভেসে গেলে কী হবে? গ্রামের অকল্যাণ হবে না

তো! গোটা গ্রামেই ছিল আতঙ্ক। কিন্তু তার থেকেও বড় আতঙ্ক ছিল কুমির নিয়ে। কে নামবে জলে? সাহসী বালক নরেন্দ্র কিছু না ভেবেই ঝাঁপ দিয়েছিলেন। পুরনো পতাকা নামিয়ে নতুন গৈরিক পতাকা বসিয়ে দিয়ে এসেছিলেন মন্দিরের চূড়ায়। আর তখনই জল থেকে ওঠার সময় হাতে নিয়ে এসেছিলেন জ্যান্ত কুমির ছানা।

ভারতীয় রাজনীতিতে স্বাধীনতার পর থেকে বেড়েছে পরিবারতন্ত্র। শুধু কেন্দ্রে নয় গোটা দেশেই সেই পরিবারতন্ত্রের ছায়া দেখা গিয়েছে। জওহরলাল নেহরু থেকে ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী হয়ে সোনিয়ার হাতে এসেছে কংগ্রেসের রাশ। এখন রাহুল গান্ধী। কিন্তু দেশের ক্ষমতায় ফেরার সম্ভাবনা এখন অনেক দূরের হয়ে গেল গান্ধী পরিবারের কাছে। গত লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে দু'টি আসন জিতেছিল কংগ্রেসে। সোনিয়া ও রাহুল। সেটাও মুলায়ম সিংহের সমর্থনে। অন্য দিকে, সমাজবাদী পার্টি জিতেছিল পাঁচটি আসনে। তাঁরা সকলেই ছিলেন যাদব পরিবারের সদস্য। এঁদের বিরুদ্ধেও প্রার্থী দেয়নি কংগ্রেস।

অন্য দিক থেকে উত্তরপ্রদেশের যাদব পরিবারও কম যায় না। মুলায়ম সিংহ পরিবারে অনেক কোন্দল থাকলেও উত্তরপ্রদেশের 'যাদব বংশ'ই দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক পরিবার। চমকে যেতে হয় যাদব পরিবারের বংশতালিকা দেখলে। সেখানে সবাই নেতা, সবাই বড় বড় দায়িত্বে। বিধানসভা নির্বাচনেও 'নেতাজি' মুলায়ম সিংহ যাদবের গোটা পরিবারই অংশ নিয়েছিল। ছেলে অখিলেশ থেকে ছেলের বউ ডিম্পল, অপর্ণারা রাজনীতির সামনের সারিতে। এছাড়াও, ভাই ভাইপো, ভাইপো বউ, শ্যালক--- কারোকেই রাজনৈতিক 'মধুভাণ্ড' থেকে বঞ্চিত করেননি মুলায়ম সিংহ যাদব। এবার উত্তরপ্রদেশের ফল বলে দিল আর 'পরিবারতন্ত্র'-এর পাশে নেই মানুষ।

দেশের দুই বড় রাজনৈতিক পরিবার একসঙ্গে জোট বেঁধে মোদীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিল উত্তরপ্রদেশে। আর রাজ্যে বিজেপির উত্থানে দু'টি পরিবারই কার্যত কোণঠাসা। সত্যি সত্যিই মোদীর হাতে বধ হলো রাজনৈতিক 'হাঙর' পরিবারতন্ত্র।

—সুন্দর মৌলিক

রাম-নামে তোবা : পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বইপত্রে মুসলমান তোষণ

অচিন্ত্য বিশ্বাস

বিতর্কটা ঘনিয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি শিক্ষায় মুসলমান ধ্যানধারণা জোর করে চাপানো হচ্ছে। সাহিত্য ও ভাষায় এই প্রবণতা ভয়াবহ হয়ে উঠছে! প্রতিবাদ না করলে, শাসকদের মতলব বুঝতে না পারলে, নীরবে মেনে নিলে— এই মারণবিষ ধীর কিন্তু নিশ্চিতভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পঙ্গু করে দেবে। শুরু করি ভাষা-সাহিত্য পাঠের কিছু অংশ দিয়ে।

১

প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য ‘আমার বই’ ২০১২-তে প্রথম বের হয়, আমাদের হাতে এর চতুর্থ সংস্করণ ২০১৫-এর ছাপা। ‘ছুটির মজা ‘শরৎ এসেছে’-তে আছে ‘চারিদিকে দুগ্‌গা পুজো আর ইদের খুশি।’ (২৮১ পৃ.)। একই কথা আগের পাতা (২৮০ পৃ.)-তেও আছে। এরকম আছে বহুবার, বহু বইতে। শরৎকালে ‘ইদ’ প্রত্যেক বছর তো আসে না। হিজরি-বছর দু’ সপ্তাহ করে পিছিয়ে যায়। দুর্গা পুজো শরৎকালেই হয়। আসলে মুক্তকচ্ছ সংখ্যালঘু তোষণ করা ছাড়া এই পাঠ্যপুস্তকের অন্য কোনো লক্ষ্যই নেই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ‘আমার বই’ (প্রথম সংস্করণ ২০১৩; আমরা দেখছি চতুর্থ সংস্করণ ২০১৬)-র এক জায়গায় আছে মনীষীদের তালিকা। সঙ্গে ছবি। গান্ধীজী নেতাজী ভগৎসিংহ অরবিন্দ-র সঙ্গে বেগম রোকেয়া আর আবুল কালাম আজাদ। কোন মানদণ্ডে এদের রাখা হলো? কোনো ব্যাখ্যা নেই। দেবার প্রয়োজনও নেই! (দেখুন : ১৫৪ পৃ.)।

সাধারণত বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের রচনাই এসব পাঠ্যপুস্তকে থাকার কথা। রহিম শেখ নামে একজনের ‘ছুটি’ নামে একটি অকিঞ্চিৎকর কবিতা কেন এল বোঝা যায় না! (দেখুন : ২৩৭ পৃ. —ওই)। সুশীল জানার একটি বিচিত্র লেখা পেলাম ‘তেরো পার্বণের ছড়া’ (২৭৪ পৃ.)— যাতে কোনো পার্বণেরই নাম নেই! শিক্ষা দপ্তর কি বাংলার পালাপার্বণের স্মৃতি ঘুচিয়ে দিতে চান?

ওই বইতে একত্র আছে ‘আমার মায়ের ছবি’। মুসলমানি রীতিতে এক মহিলার সাজ দেখা গেল। (১৬৯ পৃ.) তিনি অবশ্য নাড়ু বানিয়ে বিতরণ করছেন। এই মহিলার ছবিটি পরেও অন্য পাঠ্যপুস্তকে মুসলমান বলেই দেখানো হয়েছে। এসবের পিছনে সচেতনভাবে হিন্দু সমাজকে অপমান করা হচ্ছে কিনা পাঠক বিবেচনা করবেন।

এই বইতে আছে স্বামী বিবেকানন্দের উপর একটি অনুচ্ছেদ— স্বামীজী সেখানে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি কি না বোঝা যায় না। শিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে গিয়ে তিনি ‘মানবমুক্তি’, ‘সেবাব্রত’ আর ‘স্বদেশকে...মায়ের মতো ভালোবাসা’ শিখিয়ে আসেন! (১৯৯ পৃ.)। এ বই পড়লে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শকে অপমান করা হবে না কি? সুকোমল মতি শিশুদের মনে এই ভয়ঙ্কর বিষয়গুলি ঢুকিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র বুঝে আমাদের অবশ্যই প্রতিবাদ করতে হবে।

> ন্যাবা রোগী যেমন সবকিছুই হলুদ দেখে, বর্তমান রাজ্য সরকারও তেমনি ‘রাম’ শব্দ শুনেই রাম-রাম না বলে তোবা-তোবা বলতে শুরু করেছে।

অনুবাদের স্থলে সর্বত্রই প্রায়, বইগুলিতে আছে, তরজমা। মুসলমানি ভাবধারার বলপূর্বক আধিপত্য এসেছে এই পথে। শব্দ শুধু শব্দ নয়— চিন্তাপদ্ধতিকে অধিকার করার জোরালো অস্ত্র। চতুর্থ শ্রেণীর বাংলা বই ‘পাতাবাহার’ (প্রথম সংস্করণ ২০১৩, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৫)-য়ে একটি লেখা ছাপা হয়েছে। তেৎসুকো কুবোয়ানাগি-র লেখাটি অনুবাদ করেছেন মৌসুমি ভৌমিক। তাঁর পরিচয় ‘আধুনিক বাংলা গানের তিনি একজন উল্লেখযোগ্য স্রষ্টা ও শিল্পী।’ (২০ পৃ.)। শিশুরা জানবে না--- এই মহিলা এক মুসলমানের স্ত্রী। আর, অন্য কোনো অনুবাদকের সঙ্গে কিছু মাত্র পরিচিতি তো দেওয়া নেই! পাঠ্যপুস্তকের রচয়িতা ও তার প্রচার যারা করেছেন তাদের মনের আয়নায় কিছু প্রতিফলিত হচ্ছে কি না পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত অভিভাবকরা বিচার করবেন।

জসীম উদ্দিন বাংলার সমাদৃত কবি। ওই বইতে তাঁর ‘বর্ষার প্রার্থনা’ ছাপা হয়েছে। আকাশ সেখানে ‘আসমান’, জল সেখানে ‘পানি’। প্রথম দিকেই আছে আল্লা যেন মেঘ, পানি আর ছায়া দেয়। এসব বইতে বহু গান আছে। সেগুলোর লক্ষ্য সাহিত্যপাঠের

আস্বাদ প্রদান নয়— অন্য কিছু। এসবের মাধ্যমে আসলে বিদ্যালয়ে নাচগানের আনন্দজনক পরিবেশই হয়তো আশা করছেন কর্তৃপক্ষ। এই গানের মধ্য দিয়ে সবাইকে দিয়ে আল্লার নাম নেওয়ানোর লক্ষ্য পূরণ হবে নিশ্চয়। কিন্তু জসীম উদ্দীনের কোনো সুন্দর কবিতা কি বাছা যেত না! ''মস্তিষ্ক প্রক্ষালন যন্ত্র'' এবার 'হীরক রাজার দেশ' থেকে পশ্চিমবঙ্গেও যে এসেছে তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ্য 'বাংলা ভাষাপাঠ' (প্রথম সংস্করণ ২০১৪, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৬)-তে আছে 'বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা ও ইদ।' (৫৮ পৃ.)। ভাবুন একবার। কী রকম ভাষা শিখছে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম। 'সবচেয়ে বড়' যে কখনোই দুটি হতে পারে না, সেটা এই তালেবরদের কে বোঝাবে? একটু পরেই আছে হিন্দুদের মধ্যে পালিত হয় লক্ষ্মী পূজা-কালীপূজা ইত্যাদি। মুসলমানদের মধ্যে পালিত হয় মহরম, ইদ! তাহলে ইদ তো ধর্মীয় উৎসব? দুর্গাপূজা তাহলে কী? এসবের পিছনে যে অভিসন্ধি আছে তা বুঝতে খুব আয়াস করতে হয় না।

ষষ্ঠ শ্রেণীর 'বাংলা ভাষা চর্চা' (প্রথম সংস্করণ ২০১৪, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৬)-তে আছে 'ঋতুরাজ বসন্ত'-নামে একটি অনুচ্ছেদ। দোল সেখানে ধর্ম-বিচ্যুত আনন্দ ছাড়া কিছু নয়। আবির নেই— উপকরণ সেখানে 'মঠ, ফুটকড়াই, পিচকারি, জরিদার টুপি, অজস্র রং' (৮৩ পৃ.)। শুধু কি তাই, ভারতবাসীর 'হোরিখেলা' 'প্রকৃত সম্প্রীতির উৎসব'। একে রাধাকৃষ্ণের দোলযাত্রা বললে কি সম্প্রীতির অভাব হোত? চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো এই সম্প্রীতির আড়ালে আসল মতলবটি কীরকম 'উৎসবমুখর শরৎ'— অনুচ্ছেদটি দেখলেই বোঝা যাবে। সেখানেও আছে 'দুর্গাপূজা, ইদ, দীপাবলি' শরতের উৎসব। ইদ চানাবে সাম্য নেই। এই মূর্খের দল জানে না ইদ প্রতি বছর শরতে পড়েই না। দুর্গা পূজার সঙ্গে ভারসাম্য রাখার আসুরিক চেষ্টাতেই এসব করতে হচ্ছে।

স্বামী বিবেকানন্দকে ওই বইতে রাখা হয়েছে মীর মশারফ হোসেনের নিচে! (৮৫ পৃ.) যুক্তি হতে পারে— মীর সাহেবের জন্ম সাল আগে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকগুলির কোথাও এরকম কালানুক্রম নেই। হঠাৎ এখানে কেন? স্বামী বিবেকানন্দকে ছাত্রছাত্রীদের মনে ছোট করে আঁকার ষড়যন্ত্র না কি? আবার এখানেও স্বামী বিবেকানন্দকে হিন্দু ধর্মের স্পর্শ শূন্য করে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। তিনি 'ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্য এবং সনাতন আদর্শের কথা প্রচার করে স্বদেশকে গৌরবান্বিত করেন।' সনাতন হিন্দু আদর্শ লিখতে এঁদের কলমের কালি শুকিয়েছে। এই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে।

এমনিতে বইগুলির মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির চূড়ান্ত অভাব লক্ষ্য করা যায়। একটি ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষের শয়তানি বুদ্ধি দেখা যাচ্ছে। কী করে বাংলার পাঠ্যপুস্তকে মুসলমান স্বার্থ রক্ষার কৌশলকে সত্যের জোব্বা পরানো যায়। এই লেখায় একটিমাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। 'ভাষাচর্চা'র ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যবইটি (প্রথম সংস্করণ ২০১৪, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৬)-তে 'রাম' শব্দের অর্থ-নির্দেশ করা হয়েছে : 'বড়ো'। উদাহরণ— রামদা, রামগবেট, রামছাগল (২৯ পৃ.)। তাই যদি হবে তাহলে 'রামধনু' সরিয়ে 'পরিবেশ বিজ্ঞান' (সপ্তম শ্রেণী)-(প্রথম সংস্করণ ২০১৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৪)-তে কেন 'রংধনু' ছাপা হলো? (৩৫ পৃ.) আকাশের 'রামধনু'-টি তো বিশাল! আসলে ন্যাবা রোগী যেমন সবকিছু হলুদ দেখে, বর্তমান সরকারও তেমনি 'রাম' শব্দ শুনেই রাম রাম না বলে তোবা তোবা বলতে লেগেছেন। এদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

(লেখক গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য)

টেট কেলেঙ্কারি

দু'লাখ দিতেই হবে, বাকিটা বার্গেনিং

সাধন কুমার পাল

নিলাম হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষক পদের চাকুরি। তবে সবটাই নাকি নিয়ম মেনে, আটঘাট বেঁধেই হচ্ছে। যাতে ভবিষ্যতে তদন্তের মুখে পড়লেও ফাঁকফোকর ধরা না পড়ে। যারা 'এমপ্যানেলড' তাদের কাউন্সেলিং-এ ডাকা হচ্ছে। মাঝরাতে এমনকী কাকভোরেও প্রার্থীদের কাছে কাউন্সেলিং-এর খবর যাচ্ছে ইমেল অথবা এসএমএসের মাধ্যমে। ওয়েবসাইটেও সফল প্রার্থীদের তালিকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাউন্সেলিং-এর পর সফল প্রার্থীরা তড়িঘড়ি শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দিচ্ছেন। চলছে এক ব্যাপক কর্মযজ্ঞ।

এদিকে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বড় রকমের কেলেঙ্কারির অভিযোগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী এই সমস্ত অভিযোগের উপযুক্ত জবাব দেননি। জবাব দেওয়ার ইচ্ছেও যে সরকারের নেই সেটাও স্পষ্ট। কারণ স্বচ্ছতা আনার জন্য মেধা তালিকা প্রকাশ করা, বিভিন্ন সংরক্ষিত কোটায় কত জনের চাকুরি হলো সেই সমস্ত তথ্য প্রকাশ করা— যে ৪৩ হাজারের নিয়োগ হয়েছে বলে সরকার দাবি করছে তাদের ক্যাটিগরি-সহ নাম ঠিকানা প্রকাশ করবার মতো কোনোরকম পদক্ষেপই সরকার গ্রহণ করেনি। রাজ্য বিধানসভায় বাম-কংগ্রেস মিলে তৃণমূলের বিধায়কদের দিকে তাকিয়ে 'চোর চোর' বলছে। শাসক দলও ছিচকে চোর বলে পাল্টা দিচ্ছে। এ যেন চোরেরাই চোরেদের চোর চোর বলছে। কারণ বাম জমানায় একই রকম ভাবে নিলাম হয়েছে শিক্ষকতার চাকুরি।

সারদাকাণ্ড প্রকাশ্যে আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও প্রকাশ্য সভায় প্রশ্ন করতেন আমি চোর? মদন চোর? টুম্পাই চোর?...। বামেরা শুরু করেছিলেন, আর তৃণমূল নেত্রী রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে এমন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন যে এ রাজ্যের প্রাক্তন ও বর্তমান (তৃণমূল ও বামেরা) হর্তাকর্তা বিধাতারা চোর শব্দটি গৌরবের সঙ্গে ব্যবহার করছেন। যা দেখে সিঁধেল চোরেরাও নিজেদের সম্মানিত বোধ করতে পারেন। চিটফান্ড কাণ্ডে নেতা-মন্ত্রীরা গ্রেপ্তার হওয়ার পর আইনি লড়াইয়ের পথে না গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে ভাবে রাস্তায় নেমেছিল, টেট কাণ্ডে বিক্ষোভের জেরে চাকরি পাওয়া প্রার্থীদের নিয়ে রাস্তায় নেমে একই রকম লড়াইয়ের হুমকি দিচ্ছেন খোদ শিক্ষামন্ত্রী। আমার মনে হয় বর্তমান পরিস্থিতি যথেষ্ট ভয়ের। কারণ বাম জমানা থেকে দুর্নীতির এই ধারাবাহিকতা দেখতে দেখতে ভয় বা হতাশার মতো যে-কোনো কারণেই হোক আমজনতার মধ্যেও দুর্নীতিকে নীতি বলে মেনে নেওয়ার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। চলার পথের ছোটখাটো অভিজ্ঞতা এই প্রশ্নগুলি আরো বেশি করে তুলে দিচ্ছে। বাসে করে কর্মস্থলে যাচ্ছিলাম। আমার পাশের সিটের সহযাত্রী ওর পাশেই এসে দাঁড়ানো বন্ধুর সঙ্গে গল্প শুরু করল। বাসে ভিড় থাকলেও ওরা বেশ উচ্চস্বরেই কথা বলছিল। নানা গল্পের মধ্যে আমার পাশে বসা সহযাত্রীটি বলছে, 'দেখ এসএমএস পেতে গেলে রিচার্জ করতে হয়। আমি সঠিক জায়গায় রিচার্জ করে আগেভাগে এসএমএস পেয়ে এখন জয়েন করতে যাচ্ছি।' টেট কেমন হলো কয়টা উত্তর করলি আজকাল এগুলি অবান্তর প্রশ্ন। সঠিক জায়গায় রিচার্জ করতে পারলে সাদা খাতা দিয়েও এসএমএস পাওয়া যায়। না, কোনো হাসি মজা নয়, ওই নব্য শিক্ষক কথাগুলি বলছিল আত্মবিশ্বাস নিয়েই।

ওরা এতটাই খোলামেলা কথা বলছিল যে সহযাত্রী হিসেবে ওদের গল্পে ঢুকতে আমার কোনো সমস্যাই হলো না। আমি বললাম, 'রিচার্জ মানে?' সহযাত্রী নব্য শিক্ষকের সোজা সাপটা উত্তর, 'আমি ছ'লাখ দিয়েছি। তবে অনেকে সাত আট লাখ আবার চার পাঁচ লাখে রিচার্জ করেও এসএমএস পেয়েছে।'

না, এটি কোনো ব্যতিক্রমি ঘটনা নয়। এখন আর কোনো রাখঢাকও নেই, লোকলজ্জার ভয় নেই। নব্য শিক্ষকদের অনেককেই নগদ দিয়ে চাকুরি পাওয়ার কথা অকপটে বলতে দেখা যাচ্ছে। সফল প্রার্থীদের অনেককেই খোলা মনে প্রত্যাশীদের পরামর্শ দিতে গিয়ে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'পার্টির কেন্দ্রীয় ফান্ডের জন্য দু'লাখ দিতেই হবে, বাকিটা বার্গেনিং, যতটা কমাতে পারেন।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে মেধার ভিত্তিতে এবার একটাও হয়নি?' 'হয়েছে, তবে খোঁজ নিয়ে দেখুন সেটা টেন পার্সেন্টের বেশি নয়। আগের জমানার কথা ভুলে যান এখন এটাই নিয়ম। তবে যাদের হয়েছে দেখবেন তাদের এমন জায়গায় পোস্টিং হবে যে ভালো জায়গায় আসতে গেলে আবার মোটা দক্ষিণা দিতেই হবে। যে ভাবেই আসুন না কেন টাকা আপনার লাগবেই।' আমি বললাম, 'এতো দেখছি বাম জমানার থেকেও খারাপ অবস্থা।' নব্য শিক্ষকের উত্তর, 'না একটু ভুল করলেন, বাম জমানায় চাকুরীপ্রার্থী বামপন্থী ভাব ধারায় বিশ্বাসী ও টাকা এই দুটোর গ্যারান্টি থাকলেই চাকুরি হোত আর এখন ডান বাম নেই টাকা হলেই চাকুরি। দেখুন বর্তমান ক্ষমতাসীন দল সিপিএমের মতো নানা অজুহাতে মানুষের থেকে টাকা চাঁদা তোলে না। সামনে পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনে লড়ার জন্য পার্টি ফান্ড যেমন দরকার তেমনি নেতা কর্মীদেরও শক্তিশালী হওয়া দরকার। না হলে নির্বাচনে লড়ার জোশ আসবে কীভাবে?' নব্য শিক্ষকের কথাগুলি কতটা সত্য কথন আর কতটা মন গড়া সেটা উনিই বলতে পারবেন। চোখের সামনে যাদের চাকুরী পেতে দেখছি তাতে আমার মনে হলো না হবু মাস্টারমশাই মিথ্যে বলছেন।

কুড়ি বছর আগের স্নাতক, পড়াশোনার সঙ্গে কোনো সংযোগ নেই, রেজাল্টও ভালো

নয়, বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই, টেট পাশ করে সদ্য চাকুরীতে জয়েন করেছেন। একাধিক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে একই বাড়িতে তিন জনের চাকুরি হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের বাড়ির লোকজন টেট দিয়েছেন অথচ চাকুরি হয়নি এমন নজির নেই বললেই চলে। বিধিসম্মত কোনো অনিয়মের প্রমাণ সামনে না আসলেও বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে চাকুরি পাওয়ার এই ধরনের দৃষ্টান্তগুলি কিন্তু মানুষের দৃষ্টি এড়াচ্ছে না।

মেধার ভিত্তিতে যাদের নিয়োগ হয়েছে বলে সরকার দাবি করছে, আদালত বা কোনো নিরপেক্ষ সংস্থার তরফে তাদের মেধার পুনর্মূল্যায়ন করলেই এই অভিযোগের সততা যাচাই হবে। সবার না হোক স্যাম্পেল সার্ভের মাধ্যমে অল্প সংখ্যককে নিয়েও এটা করা যেতে পারে। তাছাড়া চাকুরি প্রার্থীদের একাংশ কিন্তু তাদের চাকুরি পাওয়ার রহস্য গোপন করছেন না। এখন এমন পরিবেশ তৈরি হয়েছে খুব কম সংখ্যক হলেও যারা মেধার ভিত্তিতে চাকুরি পেয়েছেন তারা 'চাকুরি হয়েছে' একথা প্রকাশ্যে বলতে সংকোচ করছেন। কারণ এখন পরিস্থিতি এমনই যে এই জমানায় ঘুষ ছাড়া চাকুরি হয় এটা কাউকে বিশ্বাস করানোই মুস্কিল।

শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন ১০ জেলার ১৫০ জন প্রশিক্ষিত প্রার্থীরা। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় মামলাকারীদের আবেদন শুনে মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন। কলকাতা হাইকোর্টের জারি করা নোটিশের উত্তরে আদালতে নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেয় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগপত্রে আদালতের শর্ত মানা হয়নি বলে স্বীকারোক্তি পর্ষদের। এরপরই কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, মামলার রায়ের উপর নির্ভর করবে প্রাথমিক শিক্ষকের শূন্যপদে নিযুক্ত শিক্ষকদের ভবিষ্যত।

শিক্ষামন্ত্রী নিরন্তর বলে যাচ্ছেন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোথাও কোনো দুর্নীতি নেই। অথচ কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে আগামী দিনে আপার প্রাইমারী ও গ্রুপ ডি পদের জন্য যে নিয়োগ হতে চলেছে তারও নাকি বুকিং হয়ে শেষ গেছে। ফলে আমজনতার মনে কিন্তু এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে দুর্নীতিই বর্তমান সরকারের নীতি। ফলে বাড়ছে হতাশা সেই সঙ্গে ক্ষোভও।

ক্ষমতায় থেকেও বর্তমান সরকার সারদা, রোজভ্যালির মতো কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়া ও তার জেরে মদন মিত্রের মতো দাপুটে মন্ত্রী, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো দাপুটে এমপি ও অন্যান্য নেতা ও জন প্রতিনিধিদের জেলযাত্রা আটকাতে পারেনি। ক্ষমতায় থেকেও জয়ললিতার মতো দাপুটে নেত্রীও কিন্তু নিজের কয়েদ বাস আটকাতে পারেননি। '২৩৫'-এর দম্ভ দুর্নীতিগ্রস্থ বামফ্রন্টের পতন আটকাতে পারেনি। ইতিহাস বলছে মেশিনারি যত নিখুঁত হোক না কেন দুর্নীতি হলে তা একদিন প্রকাশ্যে আসবেই। ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ ক্ষমতাসীনরা অবশ্য ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত কমই আছে। তবে নিয়োগের নামে এখন যা চলছে এটা চলতে পারে না। আমজনতা ফুসছে, সুযোগ পেলেই জবাব দেবে।

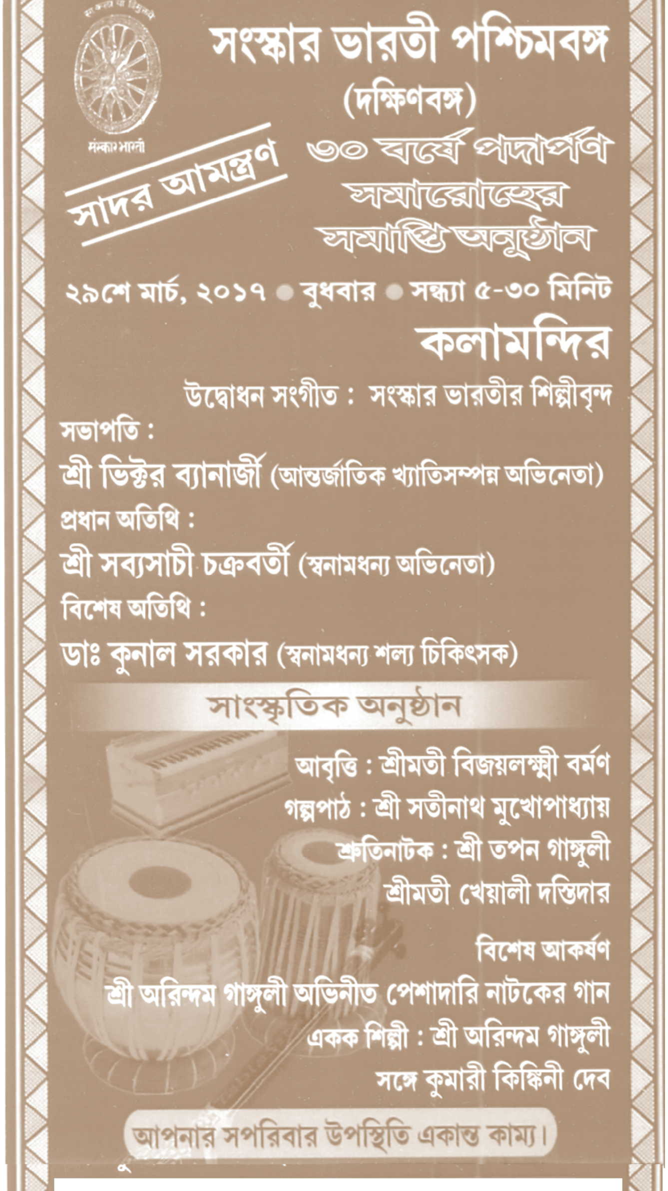

—: প্রাপ্তিস্থান :—

সংস্কার ভারতী

৫০, বলদেওপাড়া রোড, কলকাতা-৭০০০০৬
মানিকতলা ডাকঘরের বিপরীতে
সন্ধ্যা ৬-৮ টা
যোগাযোগ : ৯৮৩০৩৭৯৭৭২
৯৮৩৬৯১৪৪৩৪

হলদিঘাটের যুদ্ধের ঐতিহাসিকতায় মহারাণা প্রতাপ

সৌমেন নিয়োগী

ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসে মোগল আমলে রাজপুতানার যে হিন্দু গৌরবগাথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, তাহলো মেবারের মহারাণা প্রতাপের সঙ্গে মোগলদের নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস কাহিনি। মহারাণা প্রতাপের রাজত্বকাল ১৫৭২— ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দ। রাজ্যারোহণের সময় থেকেই মেবার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সুব্যবস্থা ও শক্তি সঞ্চয় অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। এই সময় সম্রাট আকবরও গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র মোগল-অধীনস্থ করা হেতু যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। বিনাযুদ্ধে তিনি রাণাকে বশীভূত করার জন্য কোনো কিছুরই ত্রুটি রাখেননি। ‘আকবরনামা’ থেকে জানা যায় যে সম্রাট আকবর প্রেরিত কুমার মানসিংহ এবং রাজা ভগবান দাসের আপ্যায়ন, স্তুতি ও ছলনার দ্বারা মোগলদরবারে ‘যাই যাই’ বলে প্রতিশ্রুতির অন্তরালে তিন বছরের মধ্যে যুদ্ধের আয়োজনের প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত ছিলেন, যা ছিল সত্যই যথার্থ রাজনীতি।

মহারাণা প্রতাপ ও সম্রাট আকবরের মধ্যে দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধের সূচনা হলদিঘাটের যুদ্ধ দিয়ে, যা ছিল একমাত্র খোলা ময়দানের যুদ্ধ। অন্যগুলি ছিল গেরিলা যুদ্ধ যার ফলেই মহারাণা প্রতাপ মোগল সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে অবশেষে কৃতকার্য হন।

ইতিহাস বিকৃতির জন্য ইদানীং রাজস্থান সরকারের পাঠ্যসূচিতে হলদিঘাটের যুদ্ধ আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছে। এতকাল যাবৎ আমরা জেনে এসেছি হলদিঘাটের যুদ্ধে মহারাণা প্রতাপের পরাজয় ও মোগল সম্রাট আকবরের বিজয়গাথা। সঠিক ইতিহাসকে জানতে হলে

অবশ্যই নিরপেক্ষভাবে ও যুদ্ধের সম্ভাব্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকগুলিকে তুলনামূলক বিচার করতে হবে। হলদিঘাটের যুদ্ধের সরস ও নিরপেক্ষ বর্ণনা হিসেবে নিজের ইতিহাস রচনা করে গিয়েছেন সম্রাট আকবর-অনুমোদিত মোল্লা বদায়ুনি। মোগল সৈন্যের দ্বারা ছত্রভঙ্গ হয়ে মহারাণা প্রতাপ প্রাণভয়ে পলায়ন করেছিলেন হলদিঘাটের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যা প্রত্যক্ষ্যদর্শী মোল্লা বদায়ুনির লেখনীতে ধরা পড়েনি, যিনি সেই রণাঙ্গণে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন বলে দাবি করেন। শ্রদ্ধেয় কালিকারঞ্জন কানুনগো তাঁর ‘রাজস্থান কাহিনির’ অন্তর্গত হলদিঘাটের যুদ্ধের বর্ণনায় লিখেছেন— ‘মহারাণা প্রতাপের সৈন্যর মধ্যভাগ ও দক্ষিণ ভাগের আক্রমণের সম্মুখে কুমার মানসিংহের বাহিনী যখন বিচলিত হইয়া পড়িতেছিলেন, তখনই একটি গোলমাল উঠিল, স্বয়ং বাদশা আকবর আসিতেছেন। বদায়ুনী বলেন, প্রথম আক্রমণে বাদশাহী ফৌজ হইতে যাহারা পালাইয়াছিল তাহারা নদীর (বনাস) অপর পারে পাঁচ ছয় ক্রোশ পর্যন্ত ঘোড়া দৌড়াইয়া তবেই দম লইয়াছিল। এ সময়ে মোগলবাহিনীর পৃষ্ঠরক্ষী সৈন্যদলের নেতা মেহরু খাঁ মিথ্যা রব উঠাইলেন যে, স্বয়ং জাঁহাপনা আসিতেছেন। ইহা বিশ্বাস করিয়া পলাতক সৈন্যরা ক্রমশ জমা হইয়া গেল। এই সৈন্যদল আবার সুশৃঙ্খল করিয়া তিনি মানসিংহের সাহায্যের জন্য (বোধহয় বামপক্ষ হইতে) সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন সময় মহারাণার বামপক্ষ ও মানসিংহের দক্ষিণপক্ষের সেনারা সম্মুখে ক্রমশ হঠিতে লাগিল। এই ভাগের অধ্যক্ষ ঝালাবিদা মারা যাওয়াতে হাকিম খাঁ সুর পিছু হঠিয়া মহারাণার সৈন্যদলের উপর আসিয়া পড়িলেন। এ অবস্থায় বাদশাহী ফৌজের পুনর্গঠিত বাম ও দক্ষিণ পক্ষ দ্বারা মেবার সৈন্য দুই পার্শ্ব হইতে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা দেখিয়া মহারাণা নিজের সৈন্য পিছু হঠাইয়া লইলেন। তিনি হলদিঘাটের মধ্য দিয়া পর্বতশ্রেণীর অপর পার্শ্বে ফিরিয়া আসিলেন। মেবার সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রাণভয়ে পলাইয়াছিল বলিয়া বদায়ুনী লিখেন নাই। তিনি বলেন, মহারাণার পিছু লইবার মতো সাহস ও শক্তি মোগল সৈন্যর ছিল না। দুপুর বেলায় ভীষণ ‘লু’ চলিতেছিল এবং গরমে মাথার খুলির মগজ পর্যন্ত সিদ্ধ হইতে লাগিল। মোগল সৈন্যরা বিশেষ সন্দেহ করিল রাণা পাহাড়ের পিছনে ছল করিয়া ওৎ পাতিয়া আছেন [ghuman-i-ghalibin bud]।”

মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনি স্বয়ং হলদিঘাটে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, ‘‘যুদ্ধের পর মোগল সৈন্য অত্যন্ত ক্লান্ত এবং শত্রুর পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল; অধিকন্তু রাণার গুপ্ত আক্রমণের ভয়ে বিজেতাদের সোয়াস্তি ছিল না।” ১৮ জুন ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মমনোরের কাছে মেবার ও মোগল সৈন্যের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম হয়, কুমার মানসিংহের সেনাপতিত্বে মোগল সৈন্যের সংখ্যা ছিল ৫০০০। এছাড়া কিছু অশ্বারোহী ও কয়েকটি জঙ্গিহাতী। অন্যদিকে মহারাণার সৈন্যসংখ্যা অল্প হলেও পাহাড়ের

আড়ালে থাকায় সমতলভূমিতে মোগল সৈন্যকে আক্রমণ করার সুবিধাটুকু তাঁহার ছিল, ফলে উঁচু-নীচু জমি, টিলা, টক্কর ও কাঁটা জঙ্গলের মধ্যে মোগল সৈন্যরা বেকায়দায় পড়ে। আবুল ফজল লিখেছিলেন— 'in the opinion of the superficial the foe was prevailing.' অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টিতে মনে হইল শত্রু জয়ী হইতেছে। এখন বিচার করে দেখার, দ্বাদশবর্ষব্যাপী মোগল সম্রাট আকবরের সঙ্গে মেবারের মহারাণা প্রতাপের যুদ্ধর প্রধান ঘটনাগুলি এবং যার উপর দাঁড়িয়ে আছে সত্যতার মাপকাঠি— কে প্রকৃত বিজয়ী মহারাণা প্রতাপ না মোগল সম্রাট আকবর যা অবশ্যই শুধুই হলদিঘাটের যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

মোগলদের হলদিঘাটের জয় ছিল ইংরেজদের চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধের মতো, যে জয় ছিল অনিশ্চিত ও বিপুল ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে লব্ধ। যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি হয় এটা স্বাভাবিক, কিন্তু বিজয়ীর জয় যদি সুনিশ্চিত না হয় তাকে কখনোই সম্পূর্ণ বলা যাবে না, বরং বিতর্কিত এবং হয়তো সেই কারণগুলির অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে এবং থাকবেও। এ ব্যাপারে কালিকারঞ্জন মহাশয় যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন— 'মোটের উপর চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে যেভাবে ইংরেজরা জয়ী হইয়াছিলেন, হলদিঘাটে মুসলমান পক্ষেরও সেরূপ অনিশ্চিত জয় ও অধিকতর ক্ষতি হইয়াছিল। যাহা হউক প্রতাপ স্থির করিলেন যে মোগল সৈন্যের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করা হইবে না, কারণ যুদ্ধে বিজয়ী হইলেও ইহাতে তিনি সৈন্য সংখ্যায় দুর্বল হইয়া পড়িবেন, তিনি গোগুন্দা ত্যাগ করিয়া পর্বত শ্রেণীর মধ্যে আশ্রয় করিলেন।

যুদ্ধে ব্যবহৃত শিরস্ত্রাণ ও বর্ম।

আরাবল্লীর প্রত্যেক গিরিশঙ্কট সুদৃঢ় করিয়া ভীলদের উপর উহার রক্ষার ভার দিলেন। যুদ্ধের পরদিন মানসিংহ গোগুন্দা দখল করিলেন। কিন্তু এইখানে মোগল সৈন্যরা একরকম অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল, রসদ বন্ধ, সর্বদা রাণার আক্রমণের ভয়, ইহার উপর পার্বত্য প্রদেশে দারুণ বৃষ্টি, শাহী ফৌজ কয়েকদিন ধরিয়া রুটির অভাবে শুধু পাকা আম ও মাংস খাইতে লাগিল। ইহার ফলে অনেকের পীড়া (আমাশয়?) দেখা দিল, তিন মাস পরে সম্রাট আকবর স্বয়ং আজমীর পৌঁছিলেন (২৬ সেপ্টেম্বর ১৫৭৬ খ্রি:)। ইহার পূর্বেই মানসিংহ গোগুন্দা ত্যাগ করিয়া মেবারের সমতলভূমিতে আসিয়াছিলেন। সৈন্যের দুর্দশার কথা শুনিয়া সম্রাট মানসিংহ ও আসফ খাঁকে আজমীর আসিতে আদেশ করিলেন। পুরস্কারের পরিবর্তে তাঁহাদের ভাগ্যে মিলিল তিরস্কার ও অপমান। বাদ্শা কিছুদিনের জন্য তাঁহাদিগকে দরবারে প্রবেশ নিষেধ করিলেন (Lowe's Muntakhab-ut-tawarikh ii, p. 247)." কাজেই হলদিঘাটের জয় মোগলদের সুনিশ্চিত ছিল না যার ফলে স্বয়ং সম্রাট আকবর মহারাণা প্রতাপকে দমন করবার জন্য সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে আজমীর থেকে গোগুন্দা পৌঁছিয়ে কুতবউদ্দিন খাঁ, রাজা ভগবানদাস এবং কুমার মানসিংহকে, পার্বত্য প্রদেশে রাণাকে অনুসরণ করে বন্দি করার হেতু নিযুক্ত করেন। এর মধ্যে ইডর, সিরোহি ও জালোর মোগলদের অধিগ্রহণে এলেও মহারাণাকে দমানো সম্ভব হয়নি। —"রাজা ভগবানদাস ও কুতবউদ্দিন খাঁ কিছুদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ফিরিলেন, কিন্তু প্রতাপের কোনো সন্ধানই পাইলেন না। এবার রাজশ্যালক ভগবান দাস ও কুতবউদ্দিন খাঁ তিরস্কৃত হইলেন এবং তাঁহাদের কিছুদিনের জন্য দরবারে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। সম্রাট অনেকটা হতাশ হইয়া বান্‌স্‌ওয়ারার দিকে চলিলেন, রাণাকে দমন করিবার জন্য বৈরাম খাঁ পুত্র রহিম (মান্-ই-মানান), কাসিম খাঁ মীরবহর, রাজা ভগবান দাস ও কুমার মানসিংহ গোগুন্দার দিকে প্রেরিত হইলেন। রাণা এই পাহাড়ে আছেন শুনিয়া মোগলরা ওই পাহাড় ঘিরিয়া ফেলিল। অন্যদিক হইতে রাণা আসিয়া তাহাদের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করেন— ব্যাপার এরকমই কিছুদিন চলিল। মোগল সেনাপতিরা উত্যক্ত হইয়া উদয়পুর ও গোগুন্দা হইতে থানা উঠাইয়া লইল। মোহীরথানাদার মুজহিদবেগ রাজপুতদের হাতে প্রাণ ত্যাগ করিল। এক বৎসরের মধ্যে মহারাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে তিনবার অভিযান করিয়াও মোগল সৈন্য মেবার জয় করিতে পারিল না। রাজা ভগবান দাস, মানসিংহ,

হলদিঘাটের যুদ্ধক্ষেত্র এখন।

রাণা প্রতাপের উত্তরসূরি লক্ষ্মীরাজে সিংহ ও নরেন্দ্র মোদী।

আসফ খাঁ প্রভৃতি তিরস্কৃত ও দণ্ডিত হইলেন, তবুও তাঁহাদের দ্বারা কার্যোদ্ধার হইল না। পর বৎসর অর্থাৎ ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সম্রাট আকবর আবার আজমীর আসিয়া মহারাণাকে দমন করিবার জন্য বিরাট আয়োজন করিতে লাগিলেন। আবুল ফজল লিখিয়াছেন— 'That the pleasant abode of the world may not be stained by the confusion of plurality, Rajah Bhawant Das, Kunwar Mansingh, Payinda Khan Mughal... were despatched to carry out this great work. Shah Baz Khan Mir Bakshi was appointed to command this force and the exeecution of the task committed to him" (Akbarnama iii, p. 307) ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় মহারাণা প্রতাপকে সম্রাট আকবর তাঁহার একচ্ছত্র 'প্রভুত্বের প্রধান অন্তরায় মনে করিতেন— এজন্য তাঁহাকে দমনের জন্য মোগল সম্রাটের বারংবার চেষ্টা।' হলদিঘাটের যুদ্ধ যদি প্রকৃত নিশ্চিত জয় মোগলদের হয়ে থাকে তাহলে প্রশ্ন জাগে কেন বারংবার এই যুদ্ধের আয়োজন?

শাহবাজ খাঁ-র নেতৃত্বে মোগল সৈন্য ১৫৭৮ খ্রিঃ ৩ এপ্রিল কুম্ভলমির জয় করে এবং উদয়পুর ও গোগুন্দা অধিকার করে তছনছ করে। তথাপি মহারাণা প্রতাপকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেননি। ফলে হতাশ, হতোদ্যম ও ক্লান্ত হয়ে শাহবাজ খাঁ মেবার ত্যাগ করেন। এই ধরনের গেরিলা যুদ্ধের সাহায্যে শত্রুর সামরিক শক্তিকে উপযুক্ত ভাবে নিরীক্ষণের দ্বারা, হারিয়ে যাওয়া এলাকার অধিকাংশই আবার অধিকার করতে মহারাণা সফল হয়েছিলেন। মহারাণা প্রতাপের মন্ত্রী ভামাশাহ মালব ২০,০০০ মোহর ও ২৫ লক্ষ টাকা লুঠ করে, প্রতাপকে ভেট দেন। শিশোদিয়ারা পুনরায় দিগের দুর্গ দখল করেন এবং সেখান থেকে কুম্ভলমির দুর্গ আক্রমণ করলে, মোগল সৈন্যরা প্রাণভয়ে পলায়ন করে। ইতিমধ্যে সম্রাট সীমান্তবর্তী ইউসুফজৈ পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত থাকায়, তিনি আবদুর রহিমকে মালবের সুবেদার নিযুক্ত করে সাম ও দানের দ্বারা প্রতাপকে বশীভূত করার জন্য প্রেরণ করেন। এছাড়াও মহারাণার মন্ত্রী ভামাশাহকে প্রলোভনের দ্বারা প্রতাপকে বশীভূত করার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি। কিন্তু মহারাণার অটল দুর্জয় পণের কাছে সবাই ব্যর্থ হয়েছিল। ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শাহবাজ খাঁ পুনরায় মেবার আক্রমণ করলে শত্রু সৈন্য যাতে কোনো রসদ না পায়, মহারাণা পাহাড়ের তলদেশে সবাইকে কৃষি ও পশুপালন থেকে বিরত রাখেন, ফলে তিন চার মাস পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেও শাহবাজ খাঁ ব্যর্থ হন। ১৫৮৪ খ্রিঃ থেকে ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাটের নির্দেশে জগন্নাথ কচ্ছবাহর সঙ্গে মহারাণার অবিরাম যুদ্ধ হলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে মেবার ত্যাগ করেন। কিন্তু মহারাণা এক বছরের মধ্যে চিতোর ও মান্দলগড় ছাড়া সমস্ত মেবার হস্তগত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যার ফলে তিনি তাঁর শেষ এগারো বছর শান্তি ও নির্বিঘ্নে রাজত্ব করেছিলেন। মহান বীরযোদ্ধা মহারাণা প্রতাপ ছিলেন উন্নত দেহধারী এক বলিষ্ঠ পুরুষ। আজীবন যুদ্ধে লিপ্ত থেকেও ছিলেন শারীরিক দিক দিয়ে অক্ষত। তিনি কোনও যুদ্ধে বিশেষভাবে আহত হয়েছিলেন এমন নথি নেই। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে শিকার করতে গিয়ে জোরে ধনুক কষতে গিয়ে তাঁর তলপেটে ও অন্ত্রে বিশেষ আঘাত লাগে। যার ফলে কিছুদিন রোগে কষ্ট পেয়ে ১৯ জানুয়ারি ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দেহান্ত হয়।

হলদিঘাটের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মহারাণা প্রতাপের সঙ্গে দিল্লিশ্বর আকবরের যে যুদ্ধ সূচিত হয়েছিল সেটি কখনোই complete victory ছিল না, যার ফল স্বরূপ মেবার জয়ের স্বপ্নে বিভোর সম্রাটের এত আয়োজন ও একাধিক অভিযান এবং অবশেষে তার নিষ্ফলতাই মহারাণার শৌর্যের ও বীর্যের কৃতকার্যতার মাপকাঠি। 'মহারাণার দুর্জয় সঙ্কল্পের সন্মুখে আকবরের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, মেবার স্বাধীনতার অনির্বাণ প্রদীপ আরাবল্লী শিখরে জ্বলন্ত রাখিয়া প্রতাপ বীরব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গেলেন। মহারাণা প্রতাপের ত্যাগ ও বীরত্বের নৈতিক প্রভাব সমস্ত রাজপুতনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাবরের হাতে পরাজিত হইয়া মহারাণা সংগ্রামসিংহ রাজপুতানার যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব হারাইয়াছিলেন, পঁচিশ বৎসর ভারত-সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে মেবার পুনরুদ্ধার রাজপুত জাতির মনের উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে বিরাট হিন্দু জাগরণ মোগল সাম্রাজ্যকে ধুলিসাৎ করিয়াছিল তাহার মূলে প্রতাপের মহান আদর্শের প্রেরণা কম ছিল না। প্রতাপ না জন্মিলে মহারাণা রাজসিংহ জন্মিতেন কিনা সন্দেহ। রাজসিংহ না থাকিলে মেবার ও মাড়বারে আওরঙ্গজেবের প্রচণ্ডনীতি প্রতিহত হইত না।'

হিন্দু বীরত্বের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে মহারাণা প্রতাপের শৌর্যের গান চিরদিন ভারতবাসীকে স্বাধীনতা ও স্বদেশ প্রেমের প্রেরণা প্রদান করবে এবং সমগ্র পৃথিবীতে যতদিন বীরগণ পূজিত হবেন ততদিন মহারাণার অমোঘ শৌযবীর্যের গৌরবগাথা স্বমহিমায় বিরাজ করবে। হিন্দু স্বাভিমানের এক জ্বলন্ত উদাহরণ রূপে যা ইতিহাসের শত বিকৃতির সমস্তরকম প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাহ্য করতে সর্বদা সক্ষম হবে। ■

বাংলা ভাষার ইসলামিকরণ

মিথ্যেকারের ভগবান

প্রবাল চক্রবর্তী

পাশ্চাত্যে 'ফলস গড' বলে একটি গালি প্রচলিত রয়েছে, বাংলায় যার আক্ষরিক অনুবাদ দাঁড়ায় 'মিথ্যেকারের ভগবান'। ব্যাপারটা কীরকম জানেন? ধরে নিন, কাউকে আপনি প্রাণের থেকেও বেশি বিশ্বাস করেন, তাকে প্রায় ভগবানের আসনে বসিয়ে রেখেছেন। আপনার জীবন, মানসম্ভ্রম—সবকিছুর ভার তারই হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন, সেই লোকটি আপনার শত্রুর কাছ থেকে পারিতোষিক গ্রহণ করে তলে তলে আপনারই সর্বনাশের ষড়যন্ত্র করছে। তখন তাকে কী বলবেন? মিথ্যেকারের ভগবান, তাই না? এরকম মিথ্যেকারের ভগবান বাঙালির অনেক রয়েছে।

বুদ্ধদেব গুহর 'এতোয়ারিম ও মুংলি' আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। কারণ, ওই গল্পটি ছাড়া জেহাদি ইসলামের বিরুদ্ধে আর কোনো আধুনিক নামী বঙ্গসাহিত্যিক কলম ধরেছেন, এমনটা দেখিনি। বঙ্গজীবনে সাহিত্য তথা সাহিত্যিকদের ভূমিকা অপরিসীম। বাঙালি আবেগপ্রবণ জাতি, পরের দুঃখে কাঁদতে আমাদের জুড়ি নেই। উল্টোদিকে বাংলার সাহিত্যিকরাও তাঁদের সামাজিক দায়বদ্ধতায় অনন্য। ইংরেজের ম্যাজিস্ট্রেট হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ লিখে দেশশুদ্ধ লোককে খেপিয়েছিলেন। সামাজিক দায়বদ্ধতার যে পয়স্বিনী ধারা বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ-নজরুল হয়ে নিত্য-প্রবহমানা ছিলেন, শরদিন্দু পর্যন্ত তাকে স্পষ্ট দেখতে পাই। কিন্তু তারপর? সুনীল, সুচিত্রা— এঁদের চোখের সামনেই বঙ্গসংস্কৃতি ধীরে ধীরে জেহাদিদের করাল

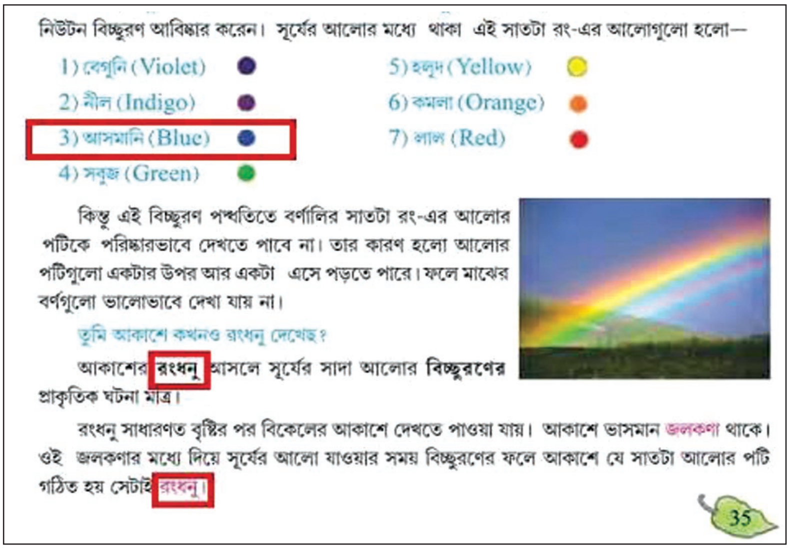
নিউটন বিচ্ছুরণ আবিষ্কার করেন। সূর্যের আলোর মধ্যে থাকা এই সাতটা রং-এর আলোগুলো হলো—

1) বেগুনি (Violet) 5) হলুদ (Yellow)
2) নীল (Indigo) 6) কমলা (Orange)
3) আসমানি (Blue) 7) লাল (Red)
4) সবুজ (Green)

কিন্তু এই বিচ্ছুরণ পদ্ধতিতে বর্ণালির সাতটা রং-এর আলোর পটিকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবে না। তার কারণ হলো আলোর পটিগুলো একটার উপর আর একটা এসে পড়তে পারে। ফলে মাঝের বর্ণগুলো ভালোভাবে দেখা যায় না।

তুমি আকাশে কখনও রংধনু দেখেছ?

আকাশের **রংধনু** আসলে সূর্যের সাদা আলোর **বিচ্ছুরণের** প্রাকৃতিক ঘটনা মাত্র।

রংধনু সাধারণত বৃষ্টির পর বিকেলের আকাশে দেখতে পাওয়া যায়। আকাশে ভাসমান জলকণা থাকে। ওই জলকণার মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো যাওয়ার সময় বিচ্ছুরণের ফলে আকাশে যে সাতটা আলোর পটি গঠিত হয় সেটাই রংধনু।

35

রামধনু থেকে রংধনু।

গ্রাসে নিমজ্জিত হয়েছে। অথচ এঁদের সাহিত্যে তার উল্লেখমাত্র পাওয়া যায় না। নোয়াখালি থেকে দেগঙ্গা, চট্টগ্রাম থেকে

> আজ যারা বাংলা ভাষাকে আক্রমণ করেছে, মা সরস্বতীকে আক্রমণ করেছে, নিশ্চিত করে বলা যায়, আগামীকাল তারা ভারতবর্ষকে আক্রমণ করবে, জনগনমন ও তেরঙ্গাকে আক্রমণ করবে। সেকুলারিজমের দোহাই দিয়েই।

মল্লারপুর, কারোর কথা বললেন না এঁরা? আর এঁদের ওপরেই নাকি আমরা আমাদের কথা বলার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলাম? ছি ছি, কী ভুল, কী লজ্জা! এইসব সাহিত্যিকদের, যাঁদের আমরা ভগবানের আসনে বসিয়েছিলাম, আজও যাঁদের বই কিনতে আমরা বইমেলায় ভিড় করি, আজ যদি তাঁদের 'মিথ্যেকারের ভগবান' বলি, সেটা কি অন্যায় হবে? আজ কথাটা আরো বেশি করে মনে হচ্ছে, কারণ বাংলাভাষা তথা বঙ্গসংস্কৃতির সবচেয়ে বড় বিপদের দিন উপস্থিত হয়েছে আজ। এর দায় মা-সরস্বতীর মিথ্যে সেবক বাংলার ওই লেখককুলকেই নিতে হবে। তাঁরাই তো আমাদের এতকাল ভুলভাল গল্প বলে আফিম খাইয়ে সত্যিকারের বিপদটাকে জানতে দেননি।

ভারতীয় সংস্কৃতির নির্যাস যে সংস্কৃতভাষা, তার প্রায় সবটুকুকেই আত্মস্থ করে জন্ম নিয়েছে বাংলাভাষা। তাই বঙ্কিম যখন বন্দে মাতরম লিখলেন, বাঙালি পাঠকদের সে গান বুঝতে অসুবিধে হয়নি। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা... অনুস্বার-বিসর্গগুলো বাদ দিলে বাকিটা তো বাংলাই! আর জিহাদিদের কাছে এটাই বাংলাভাষার সবচেয়ে বড় দোষ! যে জনগোষ্ঠী এরকম একটি ভাষায় কথা বলে, তাদের ওপর

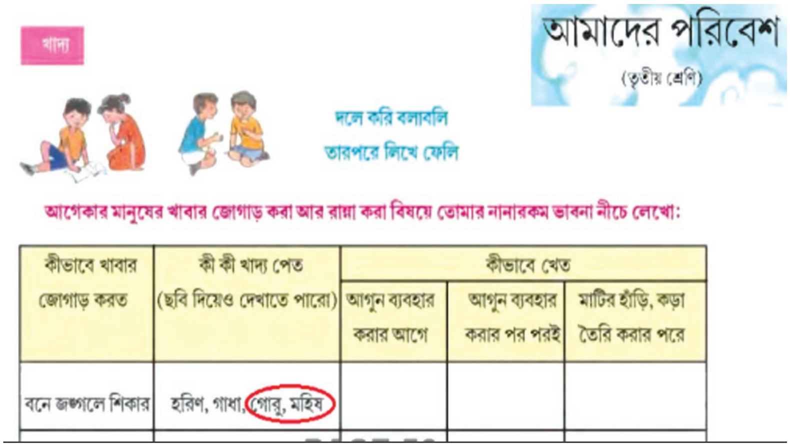
খাদ্য

আমাদের পরিবেশ

(তৃতীয় শ্রেণি)

দলে করি বলাবলি
তারপরে লিখে ফেলি

আগেকার মানুষের খাবার জোগাড় করা আর রান্না করা বিষয়ে তোমার নানারকম ভাবনা নীচে লেখো:

কীভাবে খাবার জোগাড় করত	কী কী খাদ্য পেত (ছবি দিয়েও দেখাতে পারো)	কীভাবে খেত		
		আগুন ব্যবহার করার আগে	আগুন ব্যবহার করার পর পরই	মাটির হাঁড়ি, কড়া তৈরি করার পরে
বনে জঙ্গলে শিকার	হরিণ, গাধা, গোরু, মহিষ			

খাদ্য হিসেবে গোমাংসের উল্লেখ।

বিজাতীয় আরবি সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া সোজা কথা নয়। অখণ্ড ভারতে জনসংখ্যার নিরিখে হিন্দীর পরেই বাংলার স্থান। বাঙালিকে দাস বানাতে না পারলে ঘজওয়া-এ-হিন্দ যে চিরকাল অধরাই থেকে যাবে। তাই আগেভাগে বাংলাভাষাকে গলা টিপে হত্যা করতে হবে। বাংলাভাষাকে মেরে তার জায়গায় উর্দুকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছিল এক সময়, পূর্ব পাকিস্তানে। বাংলা মায়ের দামাল ছেলেমেয়েরা সেদিন ঢাকার রাস্তায় রক্ত ঝরিয়েছিল। সেইসব মাতৃভক্ত সন্তানদের আত্মত্যাগের ফলেই পাকিস্তানি বজ্জাতি শেষপর্যন্ত সফল হয়নি। কিন্তু ওই যে, নজরুল বলেছেন না— 'যুগে যুগে মরে বাঁচে পুনঃ পাপ, দুর্মতি কুরুসেনা!' যারা সেদিন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষাটাকে খতম করতে পারেনি, তারা সেই একই কাজ শুরু করল নতুন রূপে, স্বাধীন বাংলাদেশে। কী করে? একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। একটা কানা-উঁচু পাত্রে জল ভরে একটা ব্যাঙকে তার মধ্যে রেখে দিন। এবার সেই জলকে খুব ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করতে থাকুন। ব্যাঙটা ভাববে, লাফিয়ে পালাই। কিন্তু তারপরই ভাববে, আর একটু দেখি না, জলটা এমনকী আর গরম। জলের তাপমাত্রা যত বাড়বে, ব্যাঙ তত ক্লান্ত হয়ে পড়বে। লাফিয়ে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা যত কমবে, ততই ভাববে, আরেকটু দেখি। শেষমেশ জল ফুটতে থাকবে, ব্যাঙ তাতে সেদ্ধ হয়ে মারা পড়বে। ঠিক এরকমই একটা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলো বাংলা ভাষাকে হত্যা করতে। ঠিক হলো, সরাসরি বাংলার বদলে উর্দু চালু না করে, ধীরে ধীরে বাংলা ভাষাটাকেই বদলে প্রায় উর্দু বানিয়ে দেওয়া হবে। ব্যাপারটা এত ধীরে ধীরে হবে, যে পরিবর্তনটা কেউ টেরই পাবে না। মূল বাংলা ভাষাটাকে 'হিন্দুর বাংলা ভাষা' আখ্যা দিয়ে ব্রাত্য বানিয়ে তার পাশাপাশি 'মুসলমানের বাংলা ভাষা' বলে একটা কৃত্রিম দো-আঁশলা বাংলা ভাষার সৃষ্টি করা হবে। ইসলামের নামে সেই ভাষাটাকে চাপিয়ে দেওয়া হবে বাংলাদেশের ওপর। পরিকল্পনা অনুসারে শুরু হলো বাংলা শব্দগুলোর বদলে উর্দু বা আরবি শব্দ চালু করা। ওরা বললো, 'জয়' বলা চলবে না, ওটা হিন্দু পরম্পরা। 'জিন্দাবাদ' বলতে হবে। 'জয় বাংলা' নয়, বলতে হবে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'। স্নান নয়, বলতে হবে গোসল। জলখাবার নয়, নাস্তা। 'নমস্কার' বলা নিষেধ, বলতে হবে 'সালাম আলাইকুম'।

এইভাবে চলতে থাকলে একসময় হরফ বাদে বাংলা ভাষা বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। সেদিন টুক করে বাংলা হরফটুকুকে স্থানচ্যুত করে দিলেই বাংলা আর বাংলা থাকবে না, উর্দু হয়ে যাবে। তখন ঘজওয়া-এ-হিন্দকে ঠেকায় কে! পরিকল্পনামাফিক, এই আক্রমণটা আজ আর ভাষায় সীমাবদ্ধ নেই। বাংলাদেশের ভাষা-তালিবানরা ইন্টারনেটের বিভিন্ন বাংলা উইকি ও ফোরাম প্রায় দখল করে নিয়েছে। বঙ্গসংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়, এরাই পৃথিবীকে বলে দিচ্ছে সেকথা। এইসব ফোরাম পড়লে জানতে পারবেন, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা নয়, ইদ। প্রিয় খাবার মাছ নয়, গুড়ের মিষ্টান্ন নয়, গোরুর মাংস! এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দায়িত্ব ছিল পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের। কিন্তু তাঁরা নিরুত্তর। কে জানে, বোধহয় বাংলাদেশে নিজেদের বই বিক্রির লোভে! এঁরাই আমাদের মিথ্যেকারের ভগবান।

যে প্রচেষ্টা ওপার বাংলায় সত্তরের দশকে শুরু হয়েছিল, সেটা আজ শুরু হয়েছে আমাদের শেষ আশ্রয় এই খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে। পূর্ববঙ্গে যেটা হচ্ছে ইসলামের নামে, সেটাই পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে সেকুলারিজমের নামে। বাবা-মা ঠাকুর্দা-ঠাকুমা নয়, সিলেবাস শেখাচ্ছে আব্বা-আম্মি দাদা-দাদি চাচা-চাচি নানা-নানি। এখন থেকে কাউকে আর অমুক-দাদা তমুক-দাদা বলবেন না, 'দাদা' শব্দের অর্থ এখন থেকে বড়ভাই নয়, ঠাকুর্দা! বাংলাভাষার যেখানেই হিন্দু ছোঁয়াচ রয়েছে, সেখানে আরবি-উর্দু শব্দ বসিয়ে পবিত্র করে দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গে 'রাম'-নাম আর চলবে না। এখন থেকে রামধনু হচ্ছে রংধনু। তার মানে, রামপ্রসাদী গানকে এখন থেকে রংপ্রসাদী গান বলতে হবে। শোলে সিনেমাটা পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ হবে, কারণ সে সিনেমার পটভূমি রামগড়। ক্ষুদিরাম বসুর কী হবে? উনি তো দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে ফেলেছেন, ওঁকে তো আর ডেকে এনে বলা যাবে না, নামটা বদলে ফেলুন! নেহরু তাঁকে সন্ত্রাসবাদী বলেছিলেন, দিদি কি তাঁকে সাম্প্রদায়িক তকমা লাগাবেন? আচ্ছা, রামকৃষ্ণ মিশনের কী হবে এখন? বোধহয় ওদের স্বীকৃতি বাতিল করে দেওয়া হবে। রাম ও কৃষ্ণ, দুটো নামই তো হিন্দু! অথচ, রাম শব্দটায় কারো আপত্তি থাকা উচিৎ নয়। মুসলমানরা মুসা ও ঈসাকে অবতার মানে। রামকেও অবতার মানতে বাধা কোথায়? আচ্ছা, সে না হয় ছেড়ে দিলাম। তাঁকে মহাপুরুষ মানতে তো আপত্তি নেই? শ্রীরামচন্দ্র বিরাট মাপের ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তাই বাংলাভাষায় রাম শব্দের অর্থ— বিরাট। যেমন রামদা, রামপ্যাঁদানি, রামছাগল। প্রচণ্ড ঘৃণা অর্থেও আমরা 'ছিছি এ রাম' বলি। রামধনুর রাম শব্দটাকে এভাবে বুঝতে আপত্তি কোথায়? না, তা চলবে না। তাতে

যে হিন্দু পরম্পরার গন্ধ রয়ে যায়। আসল শত্রু তো পরম্পরা, তাই না? ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মতালু— এসবের মধ্যে 'ব্রহ্ম' শব্দটা রয়েছে। তাহলে ওই শব্দগুলোও বাতিল করতে হবে? সূর্য, চন্দ্র, বৃহস্পতি, শনি— এঁরা হিন্দুশাস্ত্রে দেবতা হিসেবে বর্ণিত। বাংলা ভাষায় প্রতিটি গ্রহের ও প্রতিটি বারের নাম বদলে অন্য নাম রাখতে হবে। শ্রীমতী হলো রাধার আরেক নাম। এখন থেকে কাউকে আর 'শ্রীমতী অমুক' বলে সম্বোধন করা যাবে না। আরো কিছু পরিবর্তন দরকার। 'মানব' বা 'মানুষ' কথাটায় 'মনু' পুরাণ থেকে এসেছে। নজরুল লিখেছেন, 'নবনবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিবো মহাশ্মশান'। শ্মশান ব্যাপারটা তো হিন্দু। ওটাকেও তো বদলাতে হয় তাহলে! সিলেবাসে আকাশের জায়গায় 'আসমানী' শব্দটা ঢোকানো হয়েছে। আকাশ শব্দটা বাংলা, আসমান শব্দটা হিন্দী বা উর্দু। একই ব্যাপার জল ও পানির ক্ষেত্রেও। এঁরা বাংলাভাষা থেকে বাংলা শব্দ হঠিয়ে হিন্দী-উর্দু শব্দ ঢুকিয়ে কার সুবিধে করে দিচ্ছেন? যাদের হাতে আমরা আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের ভার তুলে দিয়েছি, তারা কি সেই ভবিষ্যৎকে আরবের দাসবাজারে বেচে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে? এ প্রশ্ন করার অধিকার বাংলার মানুষের রয়েছে।

হায়রে সুখী বাঙালি লেখককুল! এখনো কি কিছুই করবেন না? মা সরস্বতীর সেবক তো আপনারাই। সরস্বতীর অবমাননা চোখের সামনে দেখেও এখানো কি শুধুই মানবিক সম্পর্কের সাত-সতেরো লিখে অম্বলের ঢেকুর তুলবেন? মায়ের ভাষাটাই যদি ধ্বংস হয়ে যায়, ভবিষ্যতে কী দিয়ে বানিয়ে বানিয়ে কল্পনার ফানুস ওড়াবেন? জানি, আপনারা কিচ্ছুটি করবেন না। আপনারা তো অনেককাল আগেই বিবেক বেচে খেয়েছেন। যা করবার সাধারণ মানুষকেই করতে হবে। একুশে ফেব্রুয়ারি ও উনিশে মে— তারিখ দুটো আজ স্মরণ করবার সময় এসেছে। যখন পরিস্থিতি এসেছিল, পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা ও বরাক উপত্যকার বাঙালিরা পথে নেমে

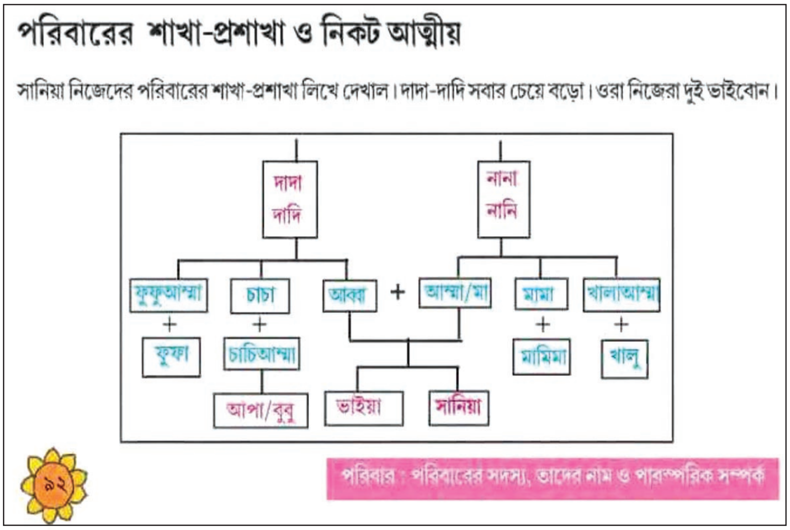

নিকট আত্মীয়দের মুসলমানি নাম।

বাংলাভাষার সম্ভ্রম রক্ষা করেছিল। আজ বলিদানের পালা এসেছে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির। আজ যদি আমরা বঙ্গসংস্কৃতির সম্ভ্রম রক্ষা করতে না পারি, তবে আগামীকাল না থাকবে বাংলা, না থাকবে বাঙালী।

কোনো নবজাতক যখন জন্মায়, তখন সে মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আরেকটি গর্ভে স্থান পায়। সে গর্ভ হল দেশজ সংস্কৃতির গর্ভ। সেখানেই লালিত-পালিত হয় জাতক। ভাষা সেই সংস্কৃতিরই অঙ্গ। এই সংস্কৃতি অনাদিকাল থেকে তিলে তিলে গড়ে ওঠে। সে সংস্কৃতিকে ইচ্ছেমতো বদলানো যায় না। বাংলা ভাষা হিন্দু সংস্কৃতি থেকে উদগত। এই দুটোকে আলাদা করা অসম্ভব। যারা সে চেষ্টা করছে, তারা আদতে দেশজ সংস্কৃতিটাকেই ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। আক্রমণটা তো শুধু ভাষার ওপরেই আসেনি, এসেছে বাগ্‌দেবী সরস্বতীর ওপরেও। তেহট্ট হাইস্কুলে তো শুধু জল মাপা হলো। সেখানে আপাতত সফল হয়ে খুব শিগগিরই রাজ্যের সব স্কুলে সরস্বতী পুজো বন্ধ হয়ে যাবে। সেকুলারিজমের নাম নিয়েই সেটা করা হবে। ভাবছেন, তাতে কি হয়েছে, নিজের বাড়িতে সরস্বতী পুজো করবেন? জেহাদি ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ কখনো এক জায়গায় থেমে থাকে না। যদি সেটা না কমে, তবে সেটা বাড়বে। মনে রাখবেন ঘরের পাশে ফেনির সেই অভাগা আজতক শিশুটির কথা, যার মা নিজের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো করছিল বলে জেহাদিরা তাকে মাতৃগর্ভেই শেষ করে দিল। গত এক বছরে পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য জায়গায় দুর্গাপূজা ও কালীপূজায় বাধা দেওয়া হয়েছে, পুজো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, বিগ্রহ ভাঙা হয়েছে।

উল্টোদিকে জেহাদিদের চাঁদা না দেওয়ার জন্য বীরভূমে ইন্দ্রজিৎ দত্তকে পিটিয়ে হত্যা করা হলো। মহরমের নৈহাটী, মিলাদুল-নবীর ধুলাগড়, সবাই ডেকে ডেকে একটাই কথা বলছে— হাওয়াই চটি নীলসাদা শাড়ি আপনাদের ওই মিথ্যেকারের ভগবানের ওপর ভরসা করে গরমজলে ব্যাঙের মতো নিশ্চিন্তে বসে থাকবেন না। যারা আজ মা সরস্বতীকে আক্রমণ করেছে, বাংলা ভাষাকে আক্রমণ করেছে, নিশ্চিত করে বলা যায়, আগামীকাল তারা ভারতবর্ষকে আক্রমণ করবে, জনগনমন ও তেরঙ্গাকে আক্রমণ করবে। সেকুলারিজমের দোহাই দিয়েই।

দেশভাগের সময় অবিভক্ত বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যা যত শতাংশ ছিল, আজ পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান জনসংখ্যা কিন্তু তার থেকে খুব একটা পিছিয়ে নেই। আজ এই অশনি সংকেতকে অগ্রাহ্য করলে খুব শিগগিরই পশ্চিমবঙ্গের হাল হবে পূর্ববঙ্গেরই মতো।

(লেখক প্রবাসী ভারতীয়)

হে ভৈরব, শক্তি দাও ভক্ত পানে চাহো

অমিতাভ সেন

তোষণবাদীদের ধারণায় ‘রাম’ একটি মারাত্মক শব্দ, কাজেই রামনাম সরানো চাই। এজন্য রামধনুকে ‘রংধনু’ বলে চালানো হচ্ছে। বাংলাভাষার ইসলামিকরণ কাকে বলে!

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন : যার কানে নেইকো সোনা/তার কথা কেউ শোনে না। অর্থাৎ যে দুর্বল, তার যত বিদ্যা ও মানবীয় গুণই থাক না কেন, সংসার তাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। ভারতবর্ষ ভাগ হবার পর পূর্ববঙ্গের বাঙালিসমাজ ইনটেলেকচুয়ালি এতই দুর্বল হয়ে পড়লো যে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষা করতে পারলো না। উর্দুভাষা প্রথম ভাষা হিসাবে বাংলার স্থান দখল করে নিল। পদ্মাপাড়ের ছাত্র দল ভাষা আন্দোলন করেছে সত্য, কিন্তু দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রসঙ্গে একটি কথাও বলেনি। বাঙালি হিন্দুদের ওপর অত্যাচার এবং ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে নিশ্চুপ ছিল। এপার বাংলার বহু অর্ধশিক্ষিত মুসলমান পূর্বপাকিস্তানে পাড়ি দিয়েছিলেন হিন্দুদের ছেড়ে আসা চাকরি পাবার আশায়। সেখানে গিয়েও স্বচ্ছন্দবোধ করেননি উর্দু ভাষার আস্ফালনের শাসনে। উৎসমুখ সংস্কৃত থেকে মৈথিলী ইত্যাদি স্রোতপথ বেয়ে বাংলা ভাষার জন্ম। ঋষি বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের মেধাশৈলীর আশ্রয়ে আধুনিক বাংলা সমৃদ্ধ হয়েছে। কাজী নজরুল, জসিমুদ্দিন, সৈয়দ মুজতবা আলির শব্দ চয়ন আধুনিক বাংলার লালিত্য বাড়িয়েছে। আরবি, ফার্সি উর্দু শব্দ বাঙালি সমাজ আত্মীকরণ করে নিয়েছে। কিন্তু বিপদটা বাড়লো যখন বাংলাভাষার ইসলামিকরণ শুরু হলো।

বেয়াজুদ্দিন আহমদ-এর ‘হজরত মুহম্মদ মোস্তাফা’ কিতাবের (১৯২৭) ভূমিকালিপি এইরূপ : উর্দুভাষা না থাকিলে ভারতের মোছলমানগণ জাতীয় ভাবহীন ও কীরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইত, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। বাংলাদেশের মোছলমানগণের মাতৃভাষা বাঙ্গালা হওয়াতে বঙ্গীয় মোছলমানগণের সর্বনাশ হইয়াছে। এই কারণে তাহারা জাতীয়তাবিহীন, নিস্তেজ, দুর্বল ও কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে। ১৯৩০ সালে ইসলাম প্রচারক এর সম্পাদকীয়-তে লেখা হয় : যেদিন আমরা এই মাতৃভাষা বাঙ্গালায় জাতীয়ভাষা আরবী, ফার্সী, উর্দু হইতে জাতীয়ভাব, জাতীয় তেজ, জাতীয় ধর্মপ্রাণতা আনয়ন করিতে পারিব, সেই মাতৃভাষা দ্বারা আমরা যথোচিত ফললাভ করিতে সক্ষম হইব। ...অন্যথায় জাতীয়ত্ব হারাইয়া হিন্দু হইয়া পড়িব।” দ্বিজাতি তত্ত্বের আস্ফালন এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ কাঠ মুল্লার মনে এমন পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট পেয়েছিল যে ইসলামি বাংলা নামে এক ভাষার জন্ম হলো। সবাই যে এ ফাঁদে পা দিলেন তা নয়। ভাবতে অবাক লাগে যে ‘মোসলেম ভারত’ সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইলাস্ট্রেশন করতেন নন্দলাল বসু, লিখতেন আব্দুল ওদুদ এস ওয়াজেদ আলি প্রভৃতি বরেণ্য লেখকরা। বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস এবং কারবালা প্রেক্ষাপটে লেখা মীরমোশারফ হোসেনের বিষাদসিন্ধু বাঙালি সমাজ সমান আবেগ ও আদরে নিয়েছে। কিন্তু এসব উদাহরণ সসীম। অসীম হচ্ছে একশ্রেণীর মানুষের এক ইচ্ছা যা বাংলাভাষাকে দাড়ি ফেজ-এ সাজাতে চায়। তার ফলশ্রুতি দেখেছিলাম খালেদা জিয়ার আমলে ইসলামি রিপাবলিক অফ বাংলাদেশে। কাজী নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হলো। ‘উর্ধ্বগগনে বাজে মাদল’ গানে ‘সজীব করিব মহাশ্মশান’ পরিবর্তন করে সরকারি উদ্যোগে ছাপানো হলো ‘সজীব করিব গোরস্তান’। বিসর্জন নাটকের চতুর্থ দৃশ্যে বলা আছে ‘দূর করে দাও হৃদয় দলনী পাষাণীরে’ সংলাপের সঙ্গে কালীমূর্তি গোমতীর জলে বিসর্জন দেবেন। বাংলাদেশে এক শ্রেণীর নাট্যগোষ্ঠী আলোক বিন্যাসের মাধ্যমে দেখায় রঘুপতি লাথি মেরে দেবীপ্রতিমা গোমতীর জলে ফেলে দিচ্ছে।

শুধু ঢাকা কেন সল্টলেকের ওকাকুরা মঞ্চে আমি একটা বাংলাদেশী নাট্যদলের নাটক দেখেছিলাম ‘সীতার বনবাস’। বিষয়বস্তু পরপুরুষের প্রতি জানকীর কামার্তি। অভিনয়শেষে আমি নাট্যকারকে প্রশ্ন করেছিলাম— কোন রামায়ণ থেকে ঘটনাসূত্র সংগ্রহ করলেন। তিনি চোখা বুদ্ধিবাজের মতো উত্তর করলেন এক মহিলার জীবনে এ ধরনের জৈবিকতা তো বাস্তব। আমি প্রশ্ন করেছিলাম : এক ইতিহাস

সিদ্ধপুরুষ জীবনে তেরোবার নিকাহ করেছিলেন, প্রথম বিবি বিশ বছর বড়ো, শেষটি চল্লিশ বছর ছোটো। আরেক মহিলা (মুমতাজ) তেরোটি সন্তানের জন্ম দিয়ে ঊনত্রিশ বছর বয়সে অ্যানিমিয়ায় ভুগে কবরে যান। অর্থাৎ যখন মা হন তখন তিনি তেরো বছরের খুকী! অথচ তাঁর স্বামী (শাহজাহান) ধর্ষক পশু হিসেবে নিন্দিত না হয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ প্রেমিক হিসেবে বন্দিত হন। এইসব ইতিহাসে ঠাঁই পাওয়া মহিলাদের মনোবেদনা নিয়ে কোনো নাট্যরচনা করা যায় কি। নাট্যকার তথা পরিচালক অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। আমাকে সাম্প্রদায়িক তত্ত্বের প্রতিভূ জ্ঞানে উদ্যোক্তারা নিষ্ক্রান্ত হবার পথটি বাতলে দিলেন।

তোষণবাদের মৃগয়াভূমি পশ্চিমবঙ্গে এখন যা চলছে তা আরও মারাত্মক। ভারতবর্ষে রাম নামের এক অনির্বচনীয় মাহাত্ম্য আছে। শব্দতত্ত্বের বিচারে ‘রাম’ শব্দ এসেছে ‘রম্’ ধাতু পদ থেকে (রম্ + অ = রাম)। রাম শব্দের বহুতর অর্থবিস্তৃতি আছে। কেউ কেউ তার অর্থবিকৃতিও করছে। রেনবো একটা ন্যাচর‍্যাল ফেনোমেনা। বাংলায় একে হরধনু, ইন্দ্রধনু, রামধনুও বলে। তোষণবাদীদের ধারণায় রাম একটি মারাত্মক শব্দ, কাজেই রামনাম সরানো চাই। এজন্য রামধনুকে রংধনু বলে চালানো হচ্ছে। রামনাম তখনও ছিল যখন অন্য সেমেটিক ধর্মের বিকাশ হয়নি। ওল্ড টেস্টামেন্ট লেখা হয়েছিল কিং রামাসিস -এর সময়। হিন্দুদের মধ্যে যেমন এককড়ি, দুকড়ি নাম রাখা হয়, মুসলমান সম্প্রদায়ে একরাম, আক্রাম নামও চালু আছে। মরিশাসের এক প্রধানমন্ত্রীর নাম ছিল শিওসাগর রামগুলাম। হিন্দুস্তানী ধ্রুপদী সঙ্গীতের এক প্রণম্য শিল্পীর নাম উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খান। উস্তাদজী ‘বড়ে’ বলতে শ্রীরামকে বুঝতেন। ইরাকে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে রামাদা তথা রামাদি শহর আছে। একটা শহরের নাম রামাল্লা— মনে হয় এটা পোস্ট ইসলাম শব্দসৃষ্টি। মুসলমানী বিয়ের গানে বাঁশি, কালোপাখি প্রভৃতি শব্দ কৃষ্ণকেই বোঝায়। একটা বিখ্যাত গান রেকর্ড করিয়েছিলেন শচীনকর্তা : একবার ঘাটে লাগাইয়া ডিঙা পান খাইয়া যাও বাঁশি, আল্লার দোহাই। নৌকাবিলাস শেষে কৃষ্ণকে অনুরোধ করা হচ্ছে, আল্লার দোহাই পেড়ে। অর্থাৎ ধর্মান্তরকরণে উপাসনা পদ্ধতির পরিবর্তন হলেও সংস্কৃতিস্রোতধারা একই আছে। পূজনীয় শ্রীগুরুজী (এম এস গোলওয়ালকর) বলতেন— ভারতবর্ষে খ্রিস্টান, মুসলমান কেউই নেই, সাংস্কৃতিক ঐক্যে সকলেই হিন্দু।

পশ্চিমবঙ্গে মহান লেখকদের পূর্ব প্রকাশিত সাহিত্যে জঘন্য পরিবর্তন চলছে। কাকার জায়গায় চাচা, দাদুর জায়গায় নানা, ফুফা প্রভৃতি শব্দ এবং কাহিনির পাত্র পাত্রীদের নাম আরবি নামে বদলে দেওয়া হচ্ছে। মুনতাসির মামুন, তসলিমা নাসরিন প্রভৃতি বহু বিদগ্ধজনের অরিজিন্যাল রচনায় এসকল শব্দ স্বাভাবিক ভাবে এসেছে। তাতে কারোর অসুবিধা হয়নি, হয়ও না। কিন্তু গোলবাধে যখন খোদার ওপর খোদকারি দেখাবার স্পর্ধা শুরু হয়। আকাশ সরিয়ে আসমান আনা হয়, সাগর ফুটো করে দরিয়া আসে। উপদ্রবের এখানেই ইতি নয়। এক সাহিত্যসভায় স্বরচিত কবিতা এক কবির আবৃত্তিতে শুনেছিলাম—

আল্লার মসজিদ মাঝে মুয়াজ্জিন প্রবীণ
তসবি হাতে স্তুভানাল্লা জপে নিশিদিন।

কবিতাটির ভাব, বিষয়, ছন্দোপ্রকরণ রবীন্দ্রনাথের ‘দেবতার বিদায়’ (চৈতালী কাব্যগ্রন্থ)-এর হুবহু অনুকরণ :

দেবতামন্দির মাঝে ভকত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।

চা-পানের অবসরে এই প্রসঙ্গ আমি তুলতে কবিবর সরাসরি জবাব দিলেন তিনি কোনো কাফের এর কিতাব পড়েন না।

অতঃকিম্—

স্মরণ করতে হবে প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী মহোদয়কে যিনি দিবারাত্র মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে তক্তারামে বিরাজ করতেন। ১৯৪৬-এর কলকাতায় ভয়ংকর দাঙ্গার পর শিবরামবাবু দাড়ি কামাতেন নেজামুদ্দিনের সেলুনে। দাড়ি কামাবার আরামে চোখ জুড়ে এসেছিল হয়ত। তন্দ্রা ভাঙলো নেজামের প্রশ্নে— বাবুজী আপনি কার পক্ষে? হিন্দুস্তান না পাকিস্তান—

জবাব না দিয়ে তিনি ফিরতি প্রশ্ন করলেন— তুই কার পক্ষে?

—হামি পাকিস্তানের পক্ষে, নেজামের সোজাসাপ্টা জবাব।

শিবরামবাবু অশ্বত্থামা হত টাইপের সুরে উত্তর দিলেন,— যতক্ষণ আমি আরামে বেকায়দায় বসে আছি আর তোর হাতে ধারালো ক্ষুর আছে, ততক্ষণ আমিও পাকিস্তানের পক্ষে—

তদন্তর—

কাজেই ওই ইনটেলেকচ্যুয়াল ব্যংক্রাপ্সি ও টেররিজম্ রুখতে আমাদের দেহে মনে শক্তিমান হতে হবে। দেহে আর মনে চাই শীতের শেষে তুষার গলানো উত্তাপ...।

(লেখক সাধারণ সম্পাদক, ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি (প:ব: শাখা)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার গ্রাহক ও এজেন্টদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন। ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

এই সময়

সাফ জবাব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পশ্চিমবঙ্গে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ ও ডালখোলা ফ্লাইওভার নির্মাণ নিয়ে রায়গঞ্জের সিপিএম সাংসদ মহম্মদ সেলিমের এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করি সাফ জানিয়ে দেন— জমি অধিগ্রহণ না করেই এই অবস্থা। তবে যেহেতু তাঁর দপ্তর থেকে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে, তাই এক সপ্তাহের মধ্যেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। 'না হলে আপনি আমায় আবার প্রশ্ন করবেন।' স্পিকার সুমিত্রা মহাজনের মন্তব্য— জবাব এরকমই হওয়া উচিত।

সেফ প্যাসেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ডিব্রুগড়ের বাসিন্দা ধ্রুবজ্যোতি ও হিমাক্ষী কলিতা-র ৮ দিনের কন্যাসন্তানের প্রথম মল ফুসফুসে আটকে

গিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি শুরু হয়। এক্ষত্রে দিল্লির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গঙ্গারাম হাসপাতালে পৌঁছানোই ছিল তাদের কাছে সবচেয়ে বড় বাধা। দিল্লির যানজটই ছিল মূল প্রতিবন্ধক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে সেফ প্যাসেজ তৈরি হওয়ায় অসুস্থ শিশুটিকে সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। শিশুটি চিকিৎসায় ভালো সাড়া দিচ্ছে। উল্লেখ্য, মোদী ক্ষমতায় আসার পর এখন অবধি দেশে ছ'বার সেফ প্যাসেজের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কেশিয়াড়ি সরস্বতী শিশুমন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি সরস্বতী শিশু মন্দিরের এবছরই পঁচিশ বছর পূর্ণ হলো। এই উপলক্ষে স্কুলের রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও ছিলেন শতাধিক অভিভাবক। স্কুলের অভিভাবকরা কেউই সম্প্রতি বিধানসভায় তোলা সিপিএমের বিতর্ককে আমল দিতে চাননি। তাঁদের সাফ কথা, ধর্মান্ধতা বা ধর্মীয় বিভাজন যদি শেখানো হোত, তাহলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা প্রতি বছর বাড়ত না। তাঁদের অভিযোগ রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের স্বার্থে গরিব মানুষকে বিপদে ফেলছেন। তাঁরা আরও জানিয়েছেন, এখানকার সব পড়ুয়াই প্রান্তিক জনজাতির খেটে খাওয়া পরিবার থেকে আসা।

সমাবেশ সমাচার

কেরলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তাদের ওপর নৃশংস অত্যাচারের ঘটনা ঘটেই চলেছে। এরই প্রতিবাদে মানবাধিকার রক্ষা মঞ্চের তরফ থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

এই সময়

দার্জিলিংও দূষণের কোপে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে তো বটেই, শৈলশহরগুলিতেও দূষণের মাত্রা বাড়ছে। দার্জিলিঙের মতো

শৈলশহর ক্রমশ পরিণত হচ্ছে আবর্জনা ও বর্জ্যের স্তূপে। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জাতীয় পরিবেশ আদালত। এই ক্রমবর্ধমান জঞ্জালের স্তূপ তৈরিতে সমতল থেকে যাওয়া পর্যটকদের কোনো ভূমিকা রয়েছে কিনা, সে প্রশ্ন ওঠাও অসঙ্গত নয়।

গীতা-রামায়ণ নিয়ে বিল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ স্কুল-কলেজগুলিতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ভাগবত গীতা,

রামায়ণ ও মহাভারতের মতো মহাকাব্য পাঠ বাধ্যতামূলক করা হোক। গত ১০ মার্চ লোকসভায় এই মর্মে বিজেপি সাংসদ রমেশ বিধুড়ী ‘প্রাইভেট মেম্বার্স বিল পেশ করেছেন। উল্লেখ্য, সংসদের এই অধিবেশনে লোকসভায় মোট ১০৩টি প্রাইভেট বিল পেশ হয়েছে।

জেটলির বিশ্লেষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফলাফল বিচার করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছেন, কংগ্রেস দুটো ঐতিহাসিক ভুল করেছে। প্রথমটা হলো, নোট বাতিলের বিরোধিতা। আর দ্বিতীয়টা জাতীয়তাবাদের সঙ্গে আপোশ। ফলে বিজেপিরই সুবিধে হলো।

সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে বিধায়ক ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা

সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ আয়োজিত বিধায়ক ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হলো ৪ মার্চ শনিবার সন্ধ্যায় প্রতিষ্ঠানের মানিকতলাস্থিত কার্যালয়ের সভাকক্ষে। বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট মূকাভিনেতা পদ্মশ্রী নিরঞ্জন গোস্বামী। বিষয় ছিল— অভিনয় ও মূকাভিনয়। বিশিষ্ট মূকাভিনেতা তাঁর বক্তব্যে মাইম সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য তথ্য তুলে ধরলেন শ্রোতাদের কাছে। প্রখ্যাত মূকাভিনেতা যোগেশ দত্তের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন প্রথম জীবনে। তখন মাইমকে ইউরোপীয় ধারার একটি বিশেষ শিল্প বলে মনে করা হোত। নিরঞ্জন গোস্বামী মাইমকে থিয়েটারের পর্যায়ে উন্নীত করতে চাইলেন। সেই জন্য বিশিষ্ট নাট্যকার অভিনেতা শম্ভু মিত্রের কাছে তিনি প্রশিক্ষণ নেন। নিরঞ্জন গোস্বামী বলেন মাইম সঠিকভাবে করতে গেলে প্রয়োজন হয় শারীরিক ও মানসিক

নিয়ন্ত্রণ ও সংযমের। শিল্পীর সেই কারণে অ্যানাটমি, ফিজিওলজির যেমন জ্ঞান থাকতে হবে, তেমনি প্রাণায়ামের দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। শ্রী গোস্বামী চিরাচরিত কালো পোশাক পরে মূকাভিনয়ের ধারায় পরিবর্তন আনলেন। মূকাভিনয় শিল্পের ধারাটিকে উন্নত ও মনোগ্রাহী করার জন্য তিনি দক্ষিণ ভারতে কথাকলি নৃত্যগুরুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পতঞ্জলি শাস্ত্রচর্চার মাধ্যমে শরীরবৃত্তীয় জ্ঞান অর্জন করেন। ‘মাইম’কে সুন্দরভাবে প্রকাশ করার জন্য ‘পাপেট’ বা পুতুল নাচের চর্চা করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলেন। মূকাভিনয়কে প্রাঞ্জল করার জন্য ঘুচী, কর্তরী, মুষ্ঠি ইত্যাদি কিছু মুদ্রার অভিনব প্রয়োগ তিনি করেন। নিরঞ্জন গোস্বামীর মতে মাইম হলো ‘optical illusion’। এই বিষয়টি তিনি কয়েকটি প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রোতা-দর্শকদের সামনে তুলে ধরায় আলোচনা সভাটি অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়েছিল। বক্তৃতা সভায় সংস্কার ভারতীর অন্যতম উপদেষ্টা, নাট্যপ্রেমী বিমল লাট উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস

বাংলাদেশ মাইনোরিটি ওয়াচ এবং হিউমেন রাইটস অ্যালায়েন্স (বাংলাদেশ)-এর যৌথ উদ্যোগে গত ৮ মার্চ ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হলো। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান-সমাজের নারী ও শিশুরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। মাহিলাদের জন্য সমান সুযোগ, নির্যাতিতা নারীদের জন্য ন্যায় বিচারের দাবিতে তারা স্লোগান দেয়। যেমন নারী ধর্ষণ, গণধর্ষণ, অপহরণ, যৌন হিংসার শিকার হয়েছেন, তাদের জন্য ন্যায় বিচারের এবং এইসব অপরাধে যুক্তদের

এই সময়

নোট বাতিলেও রাজস্ব বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চলতি আর্থিক বছরে ফেব্রুয়ারি '১৭ পর্যন্ত যা রাজস্ব আদায় হয়েছে তা গত বছরের তুলনায় বেশি। কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের সূত্র অনুসারে, পরোক্ষ কর আদায় হয়েছে ৭.৭২ লক্ষ কোটি টাকা। গতবারের তুলনায় বৃদ্ধির হার ২২.২ শতাংশ। আবগারি শুল্ক ৩.৪৫ লক্ষ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ২০.৮ শতাংশ। কাস্টমস ডিউটি আদায়ের পরিমাণ ২.০৫ লক্ষ কোটি টাকা। গতবার যা ছিল ১.৯৪ লক্ষ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ৫.২ শতাংশ। প্রত্যক্ষ কর আদায়ের পরিমাণ ৬.১৭ লক্ষ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ১০.৭ শতাংশ।

কংগ্রেস মুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী 'কংগ্রেস মুক্ত' ভারতের ডাক দিয়েছিলেন। ২০১৪ সালে বিজেপি ও তার জোটসঙ্গী শাসিত রাজ্য ছিল মাত্র ৭টি। ২০১৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর তা বেড়ে হয়েছে ১৩টি— হরিয়ানা, গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, অসম, অন্ধ্রপ্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, অরুণাচল, উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড। ভারতের মোট জনসংখ্যা ১২৩ কোটি। সাম্প্রতিক নির্বাচনের পর দেখা যাচ্ছে বিজেপি ও তার জোটসঙ্গী শাসিত রাজ্যগুলিতে রয়েছে ৭২ কোটিরও বেশি মানুষ। শতাংশের হিসেবে যা ৫৫.৪ শতাংশ।

শাস্তির দাবিও তারা জানান। মহিলাদের এইসব দাবির পক্ষে উদ্যোক্তারা 'মানব শৃঙ্খল' তৈরি করে তাদের দাবি পূরণের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান।

মঙ্গলনিধি

গত ২ মার্চ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কুলতলি ব্লকের পূর্ব গাবতলা গ্রামের ঝাড়ুরাম মণ্ডল ও অনিমা মণ্ডলের পুত্র প্রহ্লাদ মণ্ডল (কুলতলি ১নং খণ্ডের সহ কার্যবাহ) এবং ওই ব্লকের ১১নং জালাবেড়িয়া গ্রামের হরেকৃষ্ণ কয়াল ও বিজলী কয়ালের কন্যা বন্দনা কয়াল-এর শুভ বিবাহ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ ও বধূবরণ উপলক্ষে উভয় পক্ষ থেকেই মঙ্গলনিধি প্রদান করা হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির বারুইপুর জেলা শারীরিক প্রমুখ সুস্মিতা রায়চৌধুরী, বসিরহাট জেলা প্রচারিকা নমি সরকার, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারুইপুর সহ-জেলা কার্যবাহ গণপতি মিদ্দে এবং জেলার অনেক কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

* * *

গত ৪ মার্চ সুন্দরবন জেলার ক্যানিং ১নং দীঘির পাড়ের স্বয়ংসেবক দুর্লভ মণ্ডলের বধূ, সীমা মণ্ডলের বরণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে দুর্লভের মাতা পুতুল মণ্ডল পরিবারে ও সমাজের মঙ্গলার্থে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগ কার্যবাহ ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরীর হাতে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন। অন্যান্য কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ প্রান্ত কার্যবাহ প্রবীর বিশ্বাস, জেলা প্রচারক পরিমল দলুই প্রমুখ।

* * *

গত ১২ মার্চ মুর্শিদাবাদ জেলার খণ্ড কার্যবাহ সন্দীপ দত্ত তাঁর ছোটো মেয়ে রিদ্ধিমার শুভ অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি তুলে দিলেন তার মা ও শাশুড়ি মায়ের হাত দিয়ে দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলা প্রচারক অনুপ কুমার দে-র উপস্থিতিতে ওই জেলার কার্যকারিণী সদস্য জয়েদেব মণ্ডলের হাতে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলা ধর্মজাগরণ প্রমুখ হরিহর চন্দ্র, জেলা গো-সেবা প্রমুখ প্রহ্লাদ ঘোষ। সমস্ত কার্যক্রমটি পরিচালনা করেন শক্তিপুর মহকুমার ব্যবস্থা প্রমুখ সুমন্ত গনাই।

"প্রাচীন ভারতের 'জ্ঞান' বৃথা বাক্যমাত্র নয়, এ বিষয়ে জগতের সামনে তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এটা অবশ্যই সত্য যে ভারত ছাড়া অপর কোনো দেশে তিনি আবির্ভূত হতে পারতেন না। কিন্তু এও সত্য নয় যে তিনি কেবলমাত্র বা প্রধানত ভারতীয় মনীষাই প্রকাশ করেছেন। কারণ তাঁর মধ্যে সকল মানুষের অনুভূতি ও চিন্তা মিলিত হয়েছে আর তিনি--- এই কালীভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ, মানবতার প্রতিনিধি।"

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলি আই আই টি-র কাছে অনেক কিছুই শিখতে পারে

অতিথি কলম

চেতন ভগত

বহু বহু বছর আগে আই আই টি-তে পড়াকালীন আমি ও আমার কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকা আশপাশের কলেজগুলির পড়ুয়াদের সম্পর্কে এক তুমুল ঈর্ষাকাতরতায় ভুগতাম। তার মধ্যে আমাদের থেকে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলিতে ছেলে ও মেয়ে পড়ুয়াদের তুলনামূলক হার আকর্ষণীয় ভাবে বেশি থাকাটা একটা কারণ হলেও আরও কিছু কারণ ছিল। সেখানকার পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমাদের মতো এত কড়াকড়ি ছিল না। বেশ একটা আরামপ্রদ গা-ছাড়া ব্যাপার।

আই আই টি আমাদের সদাই দলাই মলাই-এর মধ্যে রাখত। হয়তো আখমাড়াই কথাটাই সঠিকভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। প্রত্যেকটি সেমিস্টারে সে সময় ৪০টি ক্লাস টেস্ট, নিত্যনৈমিত্তিক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ছাড়াও একটি টার্মের মধ্যেই মিড টার্ম টেস্ট হয়ে যেত। সবচেয়ে চিন্তার কারণ ছিল এগুলিতে পাওয়া সাফল্যের খতিয়ান চূড়ান্ত গ্রেড নির্ধারণের ক্ষেত্রে যোগ হোত। ক্লাসে উপস্থিতি কড়াভাবে নজরে রাখা হোত। অনেক সময় (সমানকার চেহারার ছায়াও ফাইনাল ফলাফলে গিয়ে পড়ত) এমন একটা পরিস্থিতির ঠিক বিপরীতে আমাদের দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযাত্রীরা কিন্তু পার্টি করেও সময় শেষ করতে পারত না। ক্লাস-ট্লাসে তারা কশ্চিৎ কদাচিৎ উপস্থিত থাকত। বাস্তবে তাদের কাছে কলেজ বলতে বোঝাত কলেজের প্রশস্ত লনগুলিতে বসে আড্ডা জমানো। হাতে গোনা St Stephens বা SREC'র মতো কয়েকটি কলেজ ছাড়া বাকিগুলিতে বিদ্যাচর্চা ছিল তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ।

শৃঙ্খলারক্ষার করার প্রশ্নে আই আই টি-কে এক অন্য মূর্তিতে দেখা যেত। ছাত্রদের তরফে যে-কোনো ধরনের শৃঙ্খলাভঙ্গ যেমন— (১) বেশি ক্লাস কামাই করা, (২) জবরদস্তি অধ্যাপকের ঘরে ঢুকে কোনো কাগজ বার করে নেওয়া (হ্যাঁ, এমনটা ঘটেছে বলে জেনেছি), (৩) উচ্ছৃঙ্খলতা বা লণ্ডভণ্ড করে দেওয়ার চেষ্টা, (৪) মেয়েদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা প্রভৃতির মধ্যে যে-কোনো ধরনের ঘটনায় জড়ালেই তার পরিণতি ছিল খুবই শ্রুতিমধুর (ডিস্কো) অর্থে কুখ্যাত Diciplinary Committee, বা সংক্ষেপে ডিস্কো। এমনই ছিল এই ডিস্কো যে কখনও ছেড়ে কথা বলত না। খুবই আতঙ্কিত নামের অধিকারী ছিল এই ডিস্কো। কেননা ডিস্কোর শাস্তির আওতায় আই আই টি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটত। যার অর্থ ছিল অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ। এই কারণে আই আই টি'র ছাত্রদের একটা সুনাম ছিল শৃঙ্খলাপরায়ণ বলে। হ্যাঁ, আমরাও মজা করতাম, সেগুলিও সব সময় যে একেবারে সুভদ্র ছিল এমনটাও হয়তো বলা যাবে না। কিন্তু আমরা কখনই আমাদের মূল মনযোগ পড়াশোনার দিক থেকে সরে যেতে দিতাম না। বলে রাখা দরকার, কোনো দুরভিসন্ধি বা বদমাইসি ভরা মজা করার ক্ষেত্রেও আমরা কখনই একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা পেরোতাম না।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এমন কোনো লক্ষ্মণরেখা ছিল না। তাদের হাতে সক্রিয় রাজনীতি করারও পর্যাপ্ত সময় থাকত। তারা খুব সিরিয়াসলি কলেজের নির্বাচনে অংশ নিত। জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির তরুণদের জন্য নির্দিষ্ট শাখা সংগঠনগুলি তুমুল শোরগোলের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে নির্বাচনে লাঠি ঘোরাত। আজকের ভাষায় সেই সব ছাত্রনেতারা ছিল তথাকথিত ঠাণ্ডা। তাদের মাথায় সর্বদা ফেট্টি বাঁধা থাকত আর মুখে থাকত অনর্গল পরিবর্তনের হুঙ্কার। এমনি সব নেতাদের সঙ্গী হয়ে বাসভর্তি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এক কলেজ থেকে আর এক কলেজে নির্বাচনী প্রচার চালানোর মধ্যে নিশ্চিতভাবে

> “একথা কখনই বলছি না যে ছাত্রদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্বাস থাকা অপরাধ। রাজনীতিতে তাদের উৎসাহ থাকতেই পারে। কিন্তু যেই মাত্র এই নিয়ে হানাহানি, রক্তপাত ঘটে যাবে তখনই কিন্তু সীমারেখাটা লঙ্ঘিত হবে। আর সঙ্গে সঙ্গেই কর্তৃপক্ষকে দৃঢ় আপাত অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিয়ে দোষীর শাস্তি দিতে হবে।”

আসন্ন ফলিত মেকানিক্সের ওপর ক্যুইজ-এর জন্য নিজেকে তৈরি করার থেকে অনেক বেশি আমোদের খোরাক ছিল। আই আই টি'রও ছাত্র সংসদের জন্য নির্বাচন হোত। কিন্তু সেগুলি ছিল নিতান্তই আড়ম্বরহীন। সত্যি কথা বলতে কী ক্যাম্পাসের মধ্যে পোস্টার লাগানোরও অনুমতি ছিল না। আমাদের রাজনীতি নিতান্তই যে-কোনো হোস্টেল পাবে এটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের তীব্র উত্তেজনার সঙ্গে তার কোনো তুলনাই চলত না।

আজকের ভাষায় বলতে গেলে আমাদের আই আই টি'র আমরা কিন্তু দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইদের মতো সে অর্থে cool আদৌ ছিলাম না। কিন্তু একথা বুক বাজিয়ে বলতে পারি আমাদের ছাত্ররা জীবনে অনেক কিছু করত, তারা তাবড় তাবড় চাকরি পেত। আর এই কারণেই তো তারা পড়াশোনা করতে এসেছিল। আমরা কখনই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায়শই ঘটে চলা জঘন্য হিংস্র ঘটনার সাক্ষ্য হইনি। এই সদ্যই তো রামজশ কলেজে আবার হিংসার ঘটনা ঘটল। রামজশ কলেজের হিংসা নিয়েই আমরা তোলপাড় করছি। আমাদের ফোকাসটা কিন্তু ভুল দিকে রয়েছে। আমাদের বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে গেছে সহিষ্ণুতা বনাম অসহিষ্ণুতা, এবিভিপি বনাম এআইএসএ, দক্ষিণপন্থী বনাম বামপন্থী, বিজেপি বনাম কংগ্রেস। আর ভারতবর্ষে আজকাল যে রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে শেষমেশ সব তর্কতর্কির মোহনা হয় মোদীর পক্ষে বনাম মোদী বিরোধী। এটি চরম মূর্খামি। কেননা আজকের দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন, হাতের বাইরে। আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ডিন অধীনস্থ কলেজগুলির অধ্যক্ষরা সকলেই এই বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ। হায়! আমাদের এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেখানে সেরা পড়ুয়ারা পড়তে আসছে কিন্তু তাদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নিয়ম কানুন, শৃঙ্খলার কোনো বালাই নেই। নিয়মানুবর্তিতার কথা কেউ আলোচনাই করে না।

> **একথা নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে, যে সমস্ত ছাত্র এখানে পড়তে আসে তার শতকরা ৯৫ শতাংশই সঠিক বিদ্যাচর্চা করে নিজেকে ভবিষ্যতের উপযোগী করে তুলতে চায়। অবশিষ্ট ৫ শতাংশ দুর্বিনীতদের নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যর্থতার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম, পড়াশোনার আদর্শ পরিবেশের সঙ্গে উৎসুক পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎটিও ধ্বংসের মুখে পড়ছে।**

একথা নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে, যে সমস্ত ছাত্ররা এখানে পড়তে আসে তার শতকরা ৯৫ শতাংশই সঠিক বিদ্যাচর্চা করে নিজেকে ভবিষ্যতের উপযোগী করে তুলতে চায়। কর্তৃপক্ষের অবশিষ্ট মাত্র ৫ শতাংশ দুর্বিনীতদের নিয়ন্ত্রণে রাখার আমূল ব্যর্থতার ফলে একাধারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম, পড়াশোনার আদর্শ পরিবেশের সঙ্গে উৎসুক পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎটিও ধ্বংসের মুখে পড়ে যাচ্ছে। এ জিনিসও বন্ধ করা যায় যদি সত্যিকারের সদিচ্ছা থাকে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন নিয়ম থাকবে কেন যেখানে ক্লাসে না এলেও বছর শেষে অনায়াসে পরীক্ষায় বসে যাওয়া যাবে? শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির এমন গা-ছাড়া আচরণ কেন? আচ্ছা, হিংসায় প্রশ্রয় দেওয়া বা অংশগ্রহণের অপরাধে— বিগত কয়েক বছরে কতজন ছাত্রছাত্রী দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়েছে? আবার, সেই কলেজে আদৌ পড়ে না এমন লোকজন কেন এসে অবাধে কলেজের ক্যান্টিনে হল্লা বাঁধায়? তাহলে এটা কলেজ না আড্ডাখানা? আচ্ছা বলুন তো, এমনটা শুধু দিল্লি ইউনিভার্সিটি ঘিরেই বা হয় কেন? আই আই টি-গুলিতে, আই আই এম-গুলিতে, এনডিএ বা এআইআইএমএস-গুলিতে তো হয় না?

একথা কখনই বলছি না যে ছাত্রদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্বাস থাকা অপরাধ। রাজনীতিতে তাদের উৎসাহ থাকতেই পারে। কিন্তু যেই মাত্র এই নিয়ে হানাহানি, রক্তপাত ঘটে যাবে তখনই কিন্তু সীমারেখাটা লঙ্ঘিত হবে। আর সঙ্গে সঙ্গেই কর্তৃপক্ষকে দৃঢ় আপাত অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিয়ে দোষীর শাস্তি দিতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে এমন কসরৎ দেখাবার আর চেষ্টা সে বা তারা না করে। যতদিন তাদের শিক্ষাক্রম চলবে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে হবে। বহিরাগতদের কোনোক্রমেই বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ ক্যাম্পাসগুলির মধ্যে গুলতানি পাকাবার সুযোগ দেওয়া যাবে না।

আবার বলছি, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় যারা চালাচ্ছেন সবকিছু হাতের বাইরে চলে যাবার আগে, এমন একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় পতনের সীমানা ছোঁয়ার আগে তাঁদের শক্ত হাতে হাল ধরে তা ঠেকাতে হবে। আর ছাত্রদের তাদের পড়াশোনায় মন দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ তৈরি করতে হবে। চিরকাল তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে না। দেশের নানান বিষয়ে চিন্তা ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি থাকা ভাল। কিন্তু তরুণ বয়েসে সেই বিষয়ে বেশি মনঃসংযোগ করে নিজের ভবিষ্যৎ তৈরির লক্ষ্য থেকে সরে গেলে চলবে কেন? এ প্রসঙ্গে নিজেদের কখনই মিডিয়া বা রাজনীতিবিদদের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না, এতে নিজের কেরিয়ার বিপদাপন্ন হবে। চুটিয়ে কলেজ জীবন কাটাও কিন্তু এখানেই ভবিষ্যতের ভিত তৈরি কর। বেস্ট অফ লাক!

চিঠিপত্র

ট্রাম্পের শক্তিজোটে ভারত

ওবামা গিয়েছেন, ট্রাম্প এসেছেন। দীর্ঘদিন ভারতের দৃষ্টিতে আমেরিকা ছিল এক বিতর্কিত রাষ্ট্র। কমিউনিস্টদের চোখে সাম্রাজ্যবাদী এবং সেকুলারিস্ট কংগ্রেসের চোখে যুদ্ধবাজ এবং মানবতার চরম শত্রু। কিন্তু দিন বদলেছে। এসেছে একবিংশ শতাব্দী। আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টেছে। আবার ভারতের দীর্ঘমেয়াদী শাসন ক্ষমতা থেকে বামঘেষা কংগ্রেসের বিদায়ের পর জাতীয়তাবাদী বিজেপি-র উত্থান ভারতীয় রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও বিদেশ নীতিতে এনেছে ব্যাপক পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তনের কারিগর নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। যিনি ভারতে এনেছেন নবজাগরণ।

আমেরিকা সম্পর্কে পুরনো ধ্যানধারণাকে ঝেড়ে ফেলে সৃষ্টি করেন এক নতুন অধ্যায়। বিশ্বের প্রধান শক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গড়ে তোলেন এক 'ঐতিহাসিক' ও গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। ঐতিহাসিক এই কারণে, ইতিপূর্বে ভারতের কোনো রাষ্ট্রনায়ক এই কাজটি করতে সক্ষম হননি। এর প্রধান কারণ তদানীন্তন ভারত-সরকারগুলির আমেরিকা সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ তথা নেতিবাচক মনোভাব। একমাত্র মোদীই সেই চলে আসা 'ট্র্যাডিশন'-এর মূলোচ্ছেদ ঘটিয়ে আমেরিকাকে আপন করে নিয়েছেন। আর সেই সুবাদে ওবামার আমন্ত্রণে মোদী যেমন ছুটে গিয়েছেন আমেরিকায়, তেমনি মোদীর আমন্ত্রণে বিশ্বের ব্যস্ততম রাষ্ট্রপতি ওবামাও শত ব্যস্ততার মাঝেও ছুটে এসেছেন সপরিবারে ভারতে। সত্যি বলতে, স্বামী বিবেকানন্দের পর তাঁরই এক অনুগামী নরেন্দ্র মোদী আমেরিকাবাসীর মন জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই মোদী আজ বিশ্বে জনপ্রিয়তার নিরিখে অন্যতম। ভারতের বন্ধুরূপে ওবামা আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন। ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদকে বিশ্বের মাটি থেকে উপড়ে ফেলতে ভারতের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করারও অঙ্গীকার করেছেন তিনি। তাই আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়েও তাঁর সরকার জঙ্গিরাষ্ট্র পাকিস্তানকে F-16 যুদ্ধ বিমান সরবরাহ করেনি। আন্তর্জাতিক স্তরেও পাকিস্তানকে চাপে রেখেছে। ঋণ থেকেও বঞ্চিত করছে। শুধু কী তাই? ওবামা তাঁর বিদায়ী ভাষণে বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট হতে পারেন একজন 'হিন্দু'ও— একজন 'ভারতীয়'ও বলেননি। এটা হিন্দুত্বেরই জয়।

এবার ওবামার 'ব্যাটন' হাতে তুলে নিয়েছেন ট্রাম্প। নির্বাচনী প্রচারে তিনি ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ দমনে ভারতের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ক্ষমতায় এসেও তিনি সেই বার্তা দিয়েছেন মোদিকে। ফোনেই তিনি নরেন্দ্র মোদীকে জানিয়েছেন—

- প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভারতকে আমেরিকার প্রকৃত বন্ধু বলে মনে করে।
- সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের সঙ্গে আমেরিকা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে।
- বিশ্বে বিরাজমান আর্থিক ও প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত অস্থিরতার মোকাবিলায় ভারত এখন থেকে আমেরিকার প্রধান অংশীদার রূপে বিবেচিত হবে।
- ট্রাম্প ও মোদী পরস্পরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নিজেদের দেশে।
- একজোট হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে দু'দেশের সম্পর্ককে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

ট্রাম্প তাঁর এসব কথাকে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ করতে বহু ভারতীয় বংশদ্ভূতকে আমেরিকার বিভিন্ন প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করতে শুরু করে দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অজিত পাই, সীমা ভার্মা, নিক্কি হ্যালে উল্লেখযোগ্য। আর তাঁর এই নিয়োগই প্রমাণ করে আগামীদিনে আমেরিকা ভারতের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল হবে। ভারত পাবে বিশ্বে প্রাধান্য।

ইতিমধ্যেই ট্রাম্প ইজরায়েলের সঙ্গে কথা বলেছেন। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ইজরায়েলের দাবি মতো আমেরিকা সম্ভবত তাদের দূতাবাস তেলআভিভ থেকে জেরুজালেমে স্থানান্তরিত করতে যাচ্ছে। যার অর্থ, জেরুজালেমকে ইজারায়েলের অংশ বা ভূখণ্ড বলে স্বীকার করা, যা প্যালেস্তাইনসহ আরব দুনিয়া মেনে নেবে না। অর্থাৎ বিরোধ অনিবার্য। তবু ইজরায়েলকে তার ন্যায্য দাবি মেটাতে ট্রাম্প তাকেও চাইছেন নিজেদের শিবিরে— যে শিবিরে থাকবে শুধু আমেরিকা, ইজরায়েল ও ভারত। এদিকে ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শক্তিশালী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চীনের থেকেও। কিন্তু চীন ভারতের শত্রু, পাকিস্তানও শত্রু। চীন আবার পাকিস্তানের বন্ধু। তাছাড়া কমিউনিস্ট চীন আমেরিকার শত্রু। তাই চীনের বন্ধু পাকিস্তানও ইদানীং আমেরিকার শত্রু (যদিও একদা ছিল বন্ধু)। তাই চিনা আগ্রাসন ঠেকাতে আমেরিকা ঝুঁকেছে ভারতের দিকে। সত্যি বলতে, ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ ও কমিউনিস্ট স্বৈরাচারিতা নির্মূল করতে ভারতের ন্যায় গণতান্ত্রিক, শান্তিপ্রিয়, পরমাণুশক্তিধর দেশ এবং নরেন্দ্র মোদীর ন্যায় দৃঢ়চেতা, সংস্কারমুখী, জাতীয়তাবাদী ও নির্ভীক রাষ্ট্রনায়ককে প্রয়োজন ট্রাম্পের। ওদিকে রাশিয়াও ইদানীং ঝুঁকছে চীন-পাকিস্তানের দিকে, যদিও এতদিন রাশিয়া ছিল ভারতের বন্ধু। তাই চীন-রাশিয়া-পাকিস্তান জোটকে কোণঠাসা করতেই যে আমেরিকা-ইজরায়েল- ভারতকে নিয়ে এক নতুন অক্ষ শক্তির স্রষ্টা ট্রাম্প তা বলাই বাহুল্য। আসলে ইজরায়েল ফিলিস্তিনী আগ্রাসনের শিকার তার জন্মলগ্ন থেকে, যা ইসলামিক আগ্রাসনের নামান্তর। ভারতও জন্মলগ্ন থেকে পাক আগ্রাসনের শিকার এবং পরবর্তীকালে চীনা আগ্রাসনেরও শিকার। আজও ভারতকে এই দুই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের ন্যায় লড়াই করতে হচ্ছে। আর ট্রাম্প উদ্ভাবিত আমেরিকা-ইজরায়েল-

ভারতকে নিয়ে গঠিত নতুন অক্ষশক্তি বর্তমান আন্তর্জাতিক শক্তির সমীকরণকে বদলে দিয়ে এক নবশক্তি যুগের সুচনা করতে পারে। আর তাতে ভারত হবে এক মহাশক্তিধর দেশ। যার নেতৃত্বে থাকাবেন নরেন্দ্র মোদী।

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

গান্ধীজী চুপ ছিলেন না

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিতের অভিযোগ, (‘বিশেষ নিবন্ধ’ স্বস্তিকা, ২০.২.১৭), খিলাফ আন্দোলনের সময় মোপলারা ব্যাপকভাবে হিন্দুদের হত্যা করেছে, ঘারবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লুণ্ঠন করেছে, মেয়েদের ধর্ষণ করেছে, গান্ধীজী সে সময় চুপ ছিলেন। গান্ধীজী চুপ ছিলেন না। তিনি ওই সব ন্যাক্কারজনক কাজের সাফাই গেয়ে বলেছিলেন, সাহসী ধর্মভীরু মোপলারা তাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করেছে— “Brave god-fearing Moplas were fighting for what they consider as religion, and in a manner which they consider as religious”—('History, of the Freedom Movement in India'–R.C. Majunder–Vol. III, p. 161)।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

সিন্দুরদান প্রথার নেপথ্যে

সূর্যোদয়ের লালিমা। অপরূপা এই লালিমা। মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ জেগে উঠে এই লালিমায়। লালিমার রঙ লাল। লালিমা বা লাল রঙের সৌন্দর্যের কথা মনে রেখে মূল বিষয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

মানুষের জীবনে বিবাহ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শুভ উৎসব। নারী তার জীবনে সব থেকে বেশি সাজ করে বিয়ের শুভলগ্নে। এই সাজকে পরিপূর্ণতা দেয় বরের পরানো লাল রঙের সিন্দুর।

সম্ভবত প্রাচীনকালে লাল ফুলের গুঁড়ো ছিল সিন্দুরের উপাদান। সিঁথিতে সরানোর জন্য উপাদানের নাম হয় সিন্থুর বা সিন্দুর। শুভলগ্নে ব্যবহারের ফলে সিন্দুর বা লাল রঙ হয়ে যায় শুভের প্রতীক। মঙ্গলের প্রতীক। কালক্রমে সিন্দুর পরানোর রীতি বিবর্তিত হয় ধর্মীয় সংস্কারে। সিন্দুরদান প্রথায়। সধবাদের সৌভাগ্যের প্রতীক যা জ্বলজ্বল করে সিঁথিতে।

—**রাজকুমার জাজোদিয়া,**
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা

সাম্প্রতিককালে সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে দিনের পর দিন যেভাবে যথেচ্ছ ভাবে চারিদিকে হিন্দুজাতির প্রতি কোনো এক বিশেষ সম্প্রদায়ের সীমাহীন অত্যাচার, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, সহ নানাবিধ অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছে এবং অসীম সহিষ্ণু হিন্দু ভায়েরা মুখ বুঝে নীরবে দিনের পর দিন তা সহ্য করে আসছে, তা থেকে একটা প্রশ্ন জাগে যে আগামী দিনে সত্যিই কি পশ্চিমবাংলায় তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হবে? যে অঞ্চলগুলিতে হিন্দুরা এখনই সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে, সেইসব অঞ্চলে ইসলামি মৌলবাদের নিত্যনতুন ফতোয়া যেমন, সন্ধ্যাবেলায় শঙ্খ বাজানো যাবে না, সেই সব অঞ্চলের স্কুলগুলিতে সরস্বতী পূজা করা যাবে না, সরকারি রাস্তা দিয়ে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় মূর্তি বিসর্জনের জন্য শোভাযাত্রা করা নিষিদ্ধ।

এমনকী সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে আজ তিন বৎসর মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা স্কুলে সরস্বতী পূজা বন্ধ থাকে। অবশেষে কোর্টের নির্দেশে আবার শুরু হয়। মুর্শিদাবাদের বেজিনগর বাজার গ্রামে লক্ষ্মীপূজার বিসর্জনকে কেন্দ্র করে ভাঙচুর ও মনীষীদের মূর্তি ভাঙ্গা সব কিছুই মৌলবাদীদের ফতোয়ার ফলে সংঘটিত হয়। আর এসব ক্ষেত্রে প্রশাসন ও তার পুলিশ-বিভাগ থাকে নির্বিকার ও নীরব দর্শকমাত্র। এই ভাবে বর্তমানে সারা পশ্চিমবাংলা জুড়েই যেমন— মালদা, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগনা, নদীয়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলাগুলিতেই এই সব মৌলবাদীদের দৌরাত্ম্য ও নিত্য নতুন ফতোয়া আজ সারা পশ্চিমবাংলার সহিষ্ণু হিন্দু জনগণকে বিশেষ চিন্তায় ফেলেছে। আবার তার উপর আছে বাঙালি শিক্ষিত বিদগ্ধ মহল নীরব।

এই ফতোয়াবাজদের দাপটে এ রাজ্যের গণতান্ত্রিক কাঠামো আজ ধ্বংসের পথে। এমনকী শাসক দলের ভয়ে বর্তমান সংবাদপত্রগুলিও চুপচাপ। অথচ প্রাকস্বাধীনতা লগ্নে এই সমস্ত বাংলা সংবাদপত্রগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র হিন্দুদের সীমাহীন দুর্বলতার কারণে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কি এটা চেয়েছিল। গণতান্ত্রিক পশ্চিমবঙ্গ না হয়ে শরিয়তি পশ্চিমবঙ্গ। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই মুক্ত চিন্তার স্বপ্ন দেখেছিলেন?

এই মৌলবাদের রূপ দেখেই তিনি মুসলিম লিগের হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে ছিনিয়ে এনেছিলেন? ১৩৩৩ সালের মাঘ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শীর্ষক নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— “অতএব যদি মুসলমান মারে, আর পড়ে পড়ে মার খাই, তবে জানবো এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র আমাদের দুর্বলতা”— বাতাস হাল্কা হলে যেমন ঝড় আপনি উঠে, তেমনি হিন্দুরাও যতোদিন দুর্বল থাকবে ততোদিন তাদের শুধু পড়ে পড়ে মার খেতে হবে— আর ততোদিন তারা হিন্দুদেরকে অধিক দুর্বল ভাববে। যা বর্তমানে হচ্ছে ও হতে চলেছে। অতএব পশ্চিমবাংলার হিন্দু ভায়েরা একবার ভেবে দেখুন ‘দিদি না মোদী’— সময় কিন্তু শিয়রে। না হলে পরে কুলকিনারা পাবেন না।

—**পাঁচুগোপাল ঘোষ,**
মুন্সীরহাট, হাওড়া।

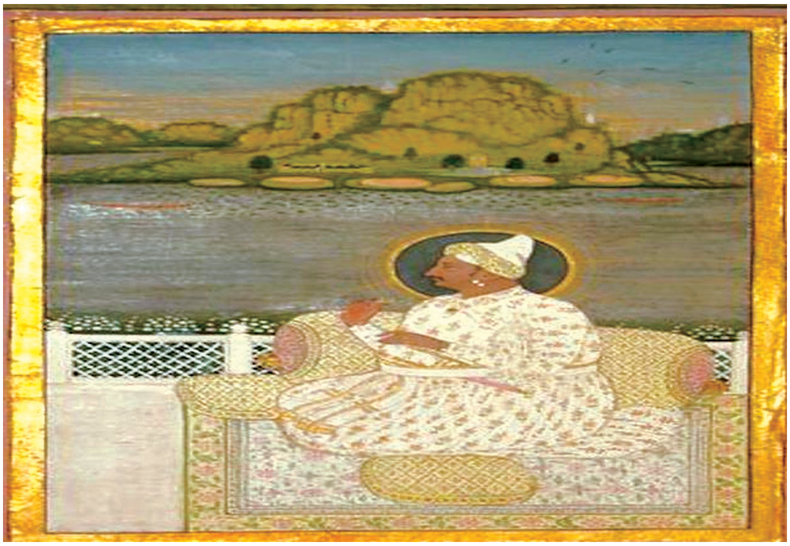

রাজা তোডরমল্ল

দেবপ্রসাদ মজুমদার

ইতিহাস মাঝে মাঝে এমন অনেক মণিমাণিক্যের সন্ধান দেয় যা দেখে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। আজ থেকে প্রায় ৫৫০ বছর আগে এক হিন্দু রাজস্ব সচিব এই সুবে বাংলায় যুদ্ধরত অবস্থায় এক বছরে রাজস্ব সম্বন্ধে এমন অনেক নতুন ও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, যার ফলে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রাজস্ব ১ কোটি ৬ লক্ষ ৯৩ হাজার ১ শত ৫২ টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দের এক ঐতিহাসিক ঘটনা এটি। কায়স্থকুলসম্ভূত ওই হিন্দু সন্তানের নাম রাজা তোডোরমল্ল। যিনি ছিলেন সম্রাট আকবরের অর্থ সচিব। বাংলাদেশের প্রাচীন দলিল দস্তাবেজে মোঘল সম্রাট আকবরের রাজস্ব সচিব ও রাজস্বমন্ত্রী তোডরমল্লের নাম দেখতে পাওয়া যায়।

তোডরমল্লের বাল্যকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তাঁর পিতার নাম ছিল ভগবতী দাস। তাঁর জন্ম হয় ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে। বাল্যেই তোডরমল্লের পিতৃবিয়োগ হয় তখন তাঁর মাতা তাঁকে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে লালন পালন করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন ও বাল্যেই তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। ছাত্র জীবনেই তিনি সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ফলস্বরূপ যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি রাজদরবারে লিপিকারের চাকরি লাভ করেন এবং এর কিছুকাল পরে তিনি বাদশাহী সৈন্য বিভাগে যোগদান করেন। এর অব্যবহিত পর থেকেই তাঁর ভাগ্যদেবীর জয়মাল্য লাভের সুযোগ ঘটে। বাস্তবিক ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধ থেকে তাঁর ভাগ্যোদয় শুরু হয়। ওই বছর তিনি সম্রাট আকবরের অধীনে থেকে খান জামানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও যুদ্ধে অসীম বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়ে যুদ্ধ জয় করেন। সম্রাট আকবর যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর অসীম সাহস ও বীরত্বে মুগ্ধ হন। তাঁর কাজের পদ্ধতি ও নিষ্ঠা ইত্যাদি লক্ষ্য করে সম্রাট আকবর তাঁকে ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করবার জন্য পাঠান। গুজরাটে গিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি রাজস্বের এমন সুব্যবস্থার প্রবর্তন করেন যাতে গুজরাটের আয় বহুগুণ বেড়ে যায়।

বাংলাদেশে তিনি ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে আসেন প্রধানত যুদ্ধ পরিচালনার জন্য। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার পাঠান নবাব দাউদ খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তাকে দমন করবার জন্য আকবর সৈন্যবাহিনী -সহ তোডরমল্লকে পাঠান এবং ওই সময় মুনিম খাঁ তাঁর সহযোগী ছিলেন। ওই সময় বাংলাদেশে দাউদ খাঁর সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে যে সকল খণ্ডযুদ্ধ হয়, তার প্রত্যেকটিতে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন। পরিণামে দাউদ খাঁকে নানা স্থানে পরাস্ত হতে হয়। বাংলার পাঠান নরপতি দাউদ খাঁ ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং চার বছর কাল মাত্র রাজত্ব করেন। তাঁর জীবনের ওই চার বছর যুদ্ধবিগ্রহেই অতিবাহিত হয়। কারণ ইতিহাস বলে যে দাউদের পিতা সুলেমান কারবানি সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু দাউদ খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেই স্বাধীন রাজার মতো আচরণ করতে থাকেন। সম্রাট আকবরের বশ্যতা অস্বীকার করবার জন্যই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। যাইহোক ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তোডরমল্লের নেতৃত্বে যে যুদ্ধ হয় তাতে দাউদ খাঁ পরাজিত ও নিহত হন, এর ফলে বাংলায় পাঠান রাজত্বের অবসান ঘটে।

দাউদ খাঁর পতনের পর দিল্লিতে ফিরে যাওয়ার পূর্বে তোডরমল্ল বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থার এমন সব নূতন নীতি ও

উৎকৃষ্ট পন্থার প্রবর্তন করেন, যার ফলে রাজস্ব ওই বছরেই বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

তোডরমল্ল যে শুধুই রাজস্ব বিষয়ে করিতকর্মা পুরুষ ছিলেন তাই নয়। তিনি ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে কিছুকাল লাহোরের শাসনকর্তা হয়েছিলেন। এছাড়া ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে গুজরাট প্রদেশের বিদ্রোহ দমন করে সম্রাটের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কেবলমাত্র বাংলাদেশ বা গুজরাটই নয়, তিনি রাজস্ব ও অর্থনীতির সুব্যবস্থা করবার জন্য চার প্রকারের সোনার মোহর এবং তিন প্রকারের রূপার টাকার প্রচলন করেন। যা এখনো বহু বনেদি বাড়িতে সম্পদ হিসাবে গচ্ছিত ও সংরক্ষিত আছে। তোডরমল্লের পূর্বে রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত হিসাবপত্র হিন্দিতে রাখা হোত, কিন্তু তিনি প্রথম ওই বিষয়ে ফারসি ভাষার প্রচলন করেন। এতে পশ্চিমের মুসলমান সভ্যতার সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতি ভারতীয়রা আয়ত্ত করে নিজ শিল্প, সাহিত্য ও সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছিল সন্দেহ নাই। তোডরমল্ল এক নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রাণ হিন্দু ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'টোডরানন্দ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থখানি একাধারে ধর্মগ্রন্থ ও জ্যোতিষশাস্ত্র হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। জীবনের শেষ পাদে তিনি হরিদ্বারের গঙ্গাতটে ধর্মচর্চা করে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি সম্রাট আকবরের সভায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আকবর রাজা তোডরমল্লকে তাঁর কর্মদক্ষতা ও প্রতিভার জন্য ভালবাসতেন ও বিশেষ সম্মান করতেন। এটা তৎকালে ব্রাহ্মণগণ পছন্দ করতেন না। তোডরমল্ল শূদ্র হওয়ায়, তাঁরা তাঁকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করতেন। নিম্নবর্ণের লোক হওয়ায় যেমন ড. বি. আর আম্বেদকরের জীবনে ঘটেছিল। যাইহোক তোডরমল্ল নিজ বুদ্ধিবলে কীভাবে সম্রাট আকবরের অধ্যক্ষতায় কায়স্থকুল যে ক্ষত্রিয়বর্ণ তা তৎকালীন ব্রাহ্মণগণের সভাতে প্রমাণ করেন, তার সুন্দর বিবরণ আমরা পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী মহারাজের লেখা 'অদ্বৈতসিদ্ধি' নামক গ্রন্থ থেকে জানতে পারি।

ঘটনাটি এইরূপ— সম্রাট আকবর তোডরমল্লের বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রতিভা ও কর্মদক্ষতায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এবং সেইজন্য তাঁকে সম্মান করতেন ও প্রাধান্য দিতেন। তাঁর অধীনে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কাজ করতেন। তাঁদের জাত্যভিমান ছিল এবং তাঁরা অনেকেই তোডরমল্লের অধীনতা পছন্দ করতেন না। তাঁরা বলাবলি করতেন যে— 'কর্মস্থানে আসিয়া প্রথমেই একজন শূদ্রের মুখদর্শন করিতে হয়— ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কী আছে? বাদশাহ ম্লেচ্ছ হইলেও রাজা বলিয়া তাঁহাকে বিষ্ণুর অংশ স্বরূপ জ্ঞান করিতে শাস্ত্রের আদেশ আছে। কিন্তু শূদ্রের নিকট মস্তক অবনত করিবার কথা শাস্ত্রে কোথাও নাই।' ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশ্য ছিল ওই কথা তোডরমল্লের কানে তোলা যাতে মর্মাহত বা বিরক্ত হয়ে অন্যকর্ম গ্রহণ করেন। তা হলে ব্রাহ্মণগণ নিশ্চিত হতে পারেন ও তাদের উন্নতির পথও সুগম হয়।

ব্রাহ্মণদের কথা শুনে তোডরমল্ল অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি ছিলেন জাতিতে কায়স্থ এবং সেজন্য নিজেকে ক্ষত্রিয় সন্তান মনে করতেন। তিনি কয়েকদিন আকবরের রাজসভায় আসলেন না। আকবর তোডরমল্লের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে তাকে ডেকে পাঠালেন। তোডরমল্ল বাদশাহের কাছে এসে সমস্ত প্রকাশ করলেন এবং সমস্যার সমাধানের জন্য বললেন যে তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত গণ্যমান্য পণ্ডিতবর্গকে নিমন্ত্রণ করবেন। সম্রাটের অধ্যক্ষতায় সভা হোক, পণ্ডিতেরা বিচার করে তাঁর বর্ণ বা জাত নির্ণয় করুন। যদি তিনি ক্ষত্রিয় সাব্যস্ত হন, তবে তিনি তাঁর বর্তমান কর্ম করবেন, অন্যথায় সম্রাট তাঁকে অন্য যে প্রকার কাজ করতে বলবেন, তিনি তাই করবেন। তিনি বললেন যে তিনি জাতিতে কায়স্থ, তিনি শূদ্র নন। তিনি আরো বললেন যে, তাঁরা অতি পূর্বকালে ব্রাহ্মণবীর পরশুরামের অত্যাচারে 'অসি' জীবীর কর্মত্যাগ করে 'মসি' জীবীর কর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই তিনি ক্ষত্রিয় কুলসম্ভূত, শূদ্র নয়।

তোডরমল্লের কথায় বাদশাহ সম্মত হলেন। যথাসময়ে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে নিয়ে এক সভা হয় এবং সম্রাট ওই সভার সভাপতি হলেন। ওই সময় ভারতবর্ষে কাশী ধর্ম, জ্ঞান, শাস্ত্র, সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান হিসেবে গণ্য হোত। ওই সভায় কাশী থেকে, তৎকালে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে খ্যাত শ্রী মধুসূদন সরস্বতী মহোদয়কে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। বিচারে বহু পণ্ডিতের মত বিনিময়ের ফলে স্থির হয় যে কায়স্থ জাতি শূদ্র নয়। তারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। এতে তোডরমল্লের জয় ঘোষিত হয়। 'কায়স্থবয়ান' নামক এক ফারসি গ্রন্থে এই ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আর ওই সভার বিবরণীতে পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী মহোদয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্বের অনুকূলে নিজ স্বাক্ষর প্রদান করেন।

তথ্যসূত্র :

১। ভারতের ইতিহাস—ড. অতুল সুর।

২। হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ—শ্রী সুধীর কুমার মিত্র।

৩। অন্যান্য সাময়িক পত্র-পত্রিকা সমূহ।

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

জন স্টুয়ার্ট বেল : (১৯২৮-১৯৯০)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান আইরিশ পদার্থ বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক। বেলের থিয়োরেম আধুনিক যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। তিনি সুইট্‌জারল্যান্ডের আন্তর্জাতিক গবেষণাগার সি.ই.আর.এন-এ কাজ করেছেন। তাঁর অন্যান্য অবদান হলো— রেল স্টেট, চিরাল অ্যানোম্যালি, বেল স্পেসসিপ্‌ প্যারাডক্স, কোয়ান্টাম এন্ট্যানগেলমেন্ট ইত্যাদি। কোয়ান্টাম ফিজিক্সের উপর লেখা তাঁর পুস্তক, 'স্পিকেব্‌ল অ্যান্ড আনস্পিকেব্‌ল ইন কোয়ান্টাম মেকানিক্স'।

উদ্ধৃতি : এটা জানা জরুরি নয় কি কোনটা এসেছে কোথা থেকে? ধরুন, একদিন সূক্ষ্মসূত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম মেকানিক্সই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ধরুন, যখন এই রকমই এক পরীক্ষণের সময়, পর্যবেক্ষকের অঙ্গুলি একগুঁয়ে ভাবে আসল বিষয় থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, ঠিক যেন হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলির দিকেই অর্থাৎ ভগবানের দিকে অথবা এক মহাজাগতিক শক্তির দিকেই সেটা ইঙ্গিত করছে! সেটা কি এক অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হবে না?

উৎস : কোয়ান্টাম এনিগমা: ফিজিক্স এনকাউন্টারস কনসাস্‌নেস— ব্রুস রোসেনবাম, ফ্রেড কুটনার।

উইলিয়াম বাটলার ইয়েট্‌স : (১৮৬৫-১৯৩৯)

পরিচিতি : ইনি বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত আইরিশ কবি, প্রাবন্ধিক ও নাট্যকার ছিলেন। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। ইয়েট্‌স বেদান্ত দর্শনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তাঁর রচিত বিখ্যাত পুস্তকটি হলো, 'দি টেন প্রিন্সিপাল উপনিষদ্‌স'।

উদ্ধৃতি : ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারেই অভ্রান্ত এবং অটল যুক্তির আলোকে আমার মনের সমস্ত ভ্রান্ত ধারণার অবসান হয়েছিল।

উৎস : ইন্ডিয়া অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশন— ডি.পি.সিঙ্ঘল।

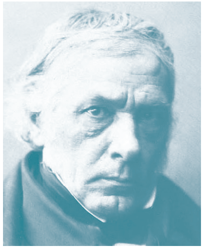

ভিক্টর কুসিন : (১৭৯২-১৮৬৭)

পরিচিতি : ইনি ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, শিক্ষা সংস্কারক এবং ঐতিহাসিক। তাঁর সুসম্বন্ধ সমন্বয়বাদ তাঁকে ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল। তাঁর লেখা পরবর্তীকালে বহু দার্শনিক যেমন থিওডোর সাইমন, জুলে সাইমন, রাল্‌ফ এমারসন প্রভৃতিকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

উদ্ধৃতি : যখন আমরা মনোযোগ দিয়ে প্রাচীন হিন্দু কাব্য এবং দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করি, তখন আমরা এক সীমাহীন সত্যের সন্ধান পাই। সেই সত্য এত গভীর ও নিঃসংশয় যে তার সম্মুখে ইউরোপীয় প্রতিভার ক্ষুদ্রতা প্রকট হয়ে পড়ে। প্রাচ্য দেশের সেই মহত্তম দর্শনের সামনে নতজানু হতে আমরা বাধ্য হই। দেখি, এটিই মানবজাতির শৈশবস্থল।

উৎস : হিন্দ স্বরাজ অ্যান্ড আদার রাইটিংস— মহাত্মা গান্ধী, সম্পাদক অ্যান্টনি পারেল।

এরউইন শ্রোইডিঙ্গার : (১৮৮৭-১৯৬১)

পরিচিতি : ইনি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি 'ওয়েভ মেকানিক্সের' উপর গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পান। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার তাঁর প্রবর্তিত 'শ্রোইডিঙ্গার ইকোয়েশন'। তাঁর লেখা বিখ্যাত বই, 'বেসিক ভিউ অফ্‌ বেদান্ত' যা ছিল শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

উদ্ধৃতি : নির্বাণ হচ্ছে এক বিশুদ্ধ স্বর্গীয় আত্মজ্ঞানের অবস্থা। এই অবস্থার সঙ্গে কোনো ব্যক্তিগত সম্বন্ধ হয় না। অহং ভাব বা তার থেকে পৃথকীকরণ হচ্ছে মায়া। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্ম সংরক্ষণ। দেহের বিনাশ হয়, কিন্তু কর্ম অবিনাশী। সেই কর্ম অন্য দেহে স্থানান্তরিত হয়।

উৎস : হোয়াট ইজ লাইফ? দ্য ফিজিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ্‌ দ্য লিভিং সেল, মাইন্ড অ্যান্ড ম্যাটার—এরউইন শ্রোইডিঙ্গার।

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁউলি। সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী, নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

অঙ্গনা

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয়

সাধিকা তরু দত্ত

রূপশ্রী দত্ত

আমার আলোচ্য সেই মহীয়সী নারী— যাঁর জন্মদিন ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস, অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানেই পড়ে। তিনি হলেন— তরু দত্ত (জন্ম ৪ মার্চ, ১৮৫৬)। আন্তর্জাতিক নারী দিবসটি উদ্‌যাপিত হয় ৮ মার্চ।

তাঁর পিতা কলকাতার উত্তরাঞ্চলের রামবাগানের বিখ্যাত দত্ত পরিবারের গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত। মাতা— ক্ষেত্রমণি। তাঁর দিদি ও দাদার নাম যথাক্রমে অরু ও অব্জু। ১৮৬২ সালে, তরুর পরিবার খ্রিস্টধর্মান্তরিত হন।

বিলেতে, কেম্ব্রিজে তিনি সপরিবারে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে উচ্চতর ফরাসি ভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন। কেম্ব্রিজে থাকার সময় (১৮৭১-৭৩) তিনি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাতে যোগদান করেন। এই সময় মেরি মার্টিনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। তরুর ভারতে ফেরা পর্যন্ত তা অটুট থাকে। মেরি ছিলেন সাসেক্স-এর রেভারেন্ড জন মার্টিনের কন্যা।

বাংলা ছাড়াও তরু ইংরেজি, ফরাসি ও পরবর্তীকালে সংস্কৃতে সুদক্ষ হয়ে ওঠেন। ইংরেজি ও ফরাসিতে তিনি অনেক গদ্য ও কবিতা লিখেছিলেন। সে সময়ের পক্ষে দুরারোগ্য যক্ষ্মায় মাত্র ২১ বছর বয়সে ৩০ আগস্ট ১৮৭৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। দুটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস তিনি ইংরেজি ভাষায় লিখে গেছেন। তাদের নাম— 'Bianca' ও 'The Young Spanish Maiden'। সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু আখ্যায়িকা, তিনি ইংরেজি ও ফরাসিতে অনুবাদ করেছিলেন। সাহিত্য- সমালোচক তরুর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন— 'ইংরেজ ও

ফরাসি লেখিকা না হয়েও, ইউরোপের যে বিস্তৃত জ্ঞানভাণ্ডার এই বঙ্গনারী তাঁর রচনায় সঞ্চারিত করেছেন, তা বিস্ময়কর এবং প্রায় অলৌকিক।' রামায়ণের সীতার জীবনী তিনি ইংরেজিতে লিখেছিলেন। তাঁর শৈশবের বাসগৃহের সংলগ্ন বাগান; ভাইবোনদের সম্মিলন— সবই ভারি সুন্দর ও আন্তরিকভাবে পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর 'Our Casurina Tree' কবিতায়।

তরুর মনে চিরদিন শিকড়ের প্রতি টান অব্যাহত ছিল। হিন্দু ধর্ম, পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ— তাঁর মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেই জন্যই তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে এগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। ১৮৭০ সালে যে চতুর্দশবর্ষীয়া কিশোরী বিদেশের মাটিতে পদার্পণ করেছিল, বিদেশের পরিবেশ, সংস্কৃতি তাঁকে মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। বঙ্গনারীর লেখনীতে তাই প্রকরণ যখন বিদেশি ভাষা, প্রসঙ্গ তখন দেশজ সংস্কৃতি। আলোকপ্রাপ্তা তরু দত্ত যেমন স্বদেশকে ভালবাসতেন, ভালবাসতেন বাংলাভাষাকে, তেমনি বিদেশের গ্রহণীয় বস্তুকেও গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। ধর্মান্তরিত হলেও, হিন্দুধর্ম ছিল তাঁর মনের গভীরে। যে যুগে অবগুণ্ঠনের নেপথ্যে বঙ্গনারীর অবহেলিত জীবন অতিবাহিত হত, সে যুগে, ঘটনাপ্রবাহের আকস্মিকতায়, তরুর জীবন উদার সংস্কৃতির আলোয় আলোকিত হয়েছিল।

এখন বাঙালি নারীর জীবনে বিশ্বায়ন প্রভাব বিস্তার করেছে। আজ থেকে কত যুগ আগে, তরুর জীবন, বিশ্বায়নের প্রভায় দীপ্ত হয়েছিল। তরু যেমন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ইতিবাচক দিকগুলি গ্রহণ করেছিলেন আমরা আশা করব আজকের বাঙালি নারীও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন। অতি-রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামি কিংবা পাশ্চাত্যমুখিনতা তথা বিশ্বায়নের উগ্র আধুনিকতা— দুই-ই বর্জনীয়। আজকের নারীকে জীবনের মূলস্রোত নিয়ে যেতে হবে, সদর্থক সমন্বয়ের দিকে— বহু যুগ আগে এক বাঙালি কিশোরী যা অবলীলাক্রমে করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

নস্যি থেকে সাবধান বাড়তে পারে প্রেসার

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

সারা পৃথিবীতে হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। প্রথমে জানা প্রয়োজন উচ্চরক্তচাপ কী? যখন আমাদের দেহের রক্তচাপ ১৪০/৯০ mmHg এই সীমাকে ছাড়িয়ে যায় তখনই আমাদের উচ্চ রক্তচাপের রোগ হয়ে যায়। যদিও ডায়াস্টলিক চাপ ৮৫ mmHg ছাড়ালেই হাইপারটেনশন বলা যায়। তেমনি সিস্টোলিক চাপ ১৩৫ mmHg ছাড়ালেই হাইপারটেনশনের আভাসপ্রাপ্ত হয়ে যায়।

উচ্চ রক্তচাপের জন্য এই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলি কী কী?

আমেরিকার কিছু নামী বিশ্ববিদ্যালয় তথা Galveston, California, Oakland, Birmingham, Alaboma, Neworeans, Lonisiau ইত্যাদির অধীনে ওখানকার কিছু সংখ্যক রোগী বা সাধারণ মানুষের উপর গবেষণা চালিয়ে কিছু তথ্য বের করা হয়েছে। ধূমহীন তামাক সেবন যথা— নস্যি নেওয়া বা তামাক চিবানো ইত্যাদি উচ্চ রক্তচাপের জন্ম দিতে পারে। যারা এইসব নিয়মিত ব্যবহার করেন তারা এ ব্যাপারে সাবধান হয়ে যান। এইসব নেশা করার ফলে রক্তে অতিরিক্ত সোডিয়াম আয়নের লোড বা বোঝা বেড়ে যায়। যার ফলশ্রুতি পাঁচ থেকে দশ mmHg চাপ বেড়ে যেতে পারে। এখানে ধূমহীন নেশা গ্রহণের ব্যাপারটা আলোকপাত করার কারণ হলো সমাজে অনেকেই আছেন যারা মনে করেন যে, সিগারেট বিড়ি ইত্যাদি খেলে যদি এত ক্ষতি হয় তাহলে অন্য পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গেই বলে রাখা ভালো, নেশা মানেই ক্ষতিকারক তা যে নেশাই হোক না কেন?

Oakland, California-তে এক সমীক্ষায়, দেখা যাচ্ছে, ১০৩১ জন ব্যক্তি যারা ছয় বছরের ঊর্ধ্বে হাইপারটেনশনে ভুগছেন, তাদের

স্থূলতার জন্য দৈহিক ওজন অতি বৃদ্ধি, মদ্যপান করা লবণ গ্রহণ এর প্রভাব আছে যা Essenitial হাই পারটেনশনকে জন্ম দিচ্ছে। স্থূলতা এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধিকে উচ্চ রক্তচাপের সুস্পষ্ট উৎস হিসাবে দেখানো হয়েছে। অতিরিক্ত অ্যালকোহল গ্রহণও হাইপারটেনশন বা উচ্চরক্তচাপ সৃষ্টির জন্য দায়ী। বিশেষ করে স্বল্প সময়ের ভিত্তিতে। উচ্চ রক্তচাপের পারিবারিক ইতিহাসে মা-মেয়ের ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য হিসেবে পাওয়া গেছে। কিন্তু পৈতৃক দিক দিয়ে নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি—

সানফ্রাসিসকোতে একটি গবেষণায় জানা গেছে Licorice Candies-এর নিয়মিত গ্রহণের ফলে উচ্চ রক্তচাপ সোডিয়াম এবং জলের পুনঃশোষণ বৃদ্ধি, অতিরিক্ত পটাসিয়াম আয়ন নির্গমন দেখা যায়। licorice Candies তৈরি হয় licorice নামক একপ্রকার গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের Root বা মূলের নির্যাস থেকে। এখানে এর ব্যবহার যষ্ঠীমধু হিসাবে, এই যষ্ঠীমধুকে অনেকে পানের সঙ্গে খান বা অনেকে কাশি হলেও গ্রহণ করে থাকেন। একজন সত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধলোক সানফ্রাসিসকো জেনারেল হসপিটালে মানসিক মন্থরতা বা Mental Slowness এবং উল্লেখ করার মতো বেশি ওজন কমাতে ভর্তি হয়েছিল। দেখা গেছে ওই রোগী দিনে পঁচিশ থেকে চল্লিশটি Licorice Candy গ্রহণ করতেন প্রায় পাঁচবছর ধরে। কিছু লক্ষণ তো Licorice Candies গ্রহণ বন্ধ করে দেওয়ার চার মাস পরও বজায় ছিল। আমরা অনেকেই বোধহয় জানি যে উচ্চরক্ত চাপের রোগীদের পাতে লবণ খেতে নেই। কারণ অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ উচ্চ রক্তচাপকে আরো বাড়িয়ে দেয়। তবে সাধারণ লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইডের মতো সকল সোডিয়াম লবণ কিন্তু উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি করে না। সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং সোডিয়াম সাইটেড নিয়ে পৃথক পরীক্ষায় এটি প্রমাণিত হয়েছে। তবে উভয় লবণ গ্রহণই কিন্তু দেহে সোডিয়ামের মাত্রা বাড়ানো, ওজন বৃদ্ধি এবং প্লাজমা এন্ডোস্টেরনের কার্যকারিতাকে বাধা দান করে। উচ্চ রক্তচাপে ভোগা রোগীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে অবহিত করছি। জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত এই ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই স্বয়ং নিয়ন্ত্রণকর্তা হতে হবে। ব্যাপারটি আর কিছুই না। রেগে যাওয়া বা ক্রোধান্বিত হওয়া বা Anxiety উচ্চ রক্তচাপ এর কারণ। Framing ham Heart Study-এর চিকিৎসকের একটি গবেষণায় দেখেছেন যে, মাত্রাতিরিক্ত ক্রোধ কিন্তু ভবিষ্যতে হাইপারটেনশনকে জন্ম দিতে পারে। পঁয়তাল্লিশ থেকে ঊনষাট বছর বয়স্কদের ক্ষেত্রে বিপদটা বেশি। তবে ক্রোধের সঙ্গে কিন্তু অন্য কিছুর পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। গবেষকরা সাম্প্রতিক এক গবেষণায় রাগের মাত্রা এবং পরবর্তী হাইপারটেনশনের মধ্যে একটি সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন মধ্য বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে যারা বাড়ির বাইরে কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকেন। তাদের ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে।

গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, মাছের তেল কিন্তু হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস উভয়েরই জন্য উপকারী। জানা গেছে ফিস ওয়েল রক্তচাপ কম করে। ফিস ওয়েলের সঙ্গে সঙ্গে মাছও কিন্তু ডায়াবেটিসের জন্য ভালো। ডায়াবেটিসের রোগীদের সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার মাছ খাওয়া ভালো। রসুন কিন্তু ব্লাডপ্রেসার কমায় এবং রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রাও কমায়। অপরদিকে টক দই পান করা কিন্তু হাইপারটেনশনের রোগীদের ক্ষেত্রে খুব উপাদেয়। সবশেষে বলা যায় একটু সাবধান হলে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

(লেখক ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হোমিওপ্যাথির আন্তর্জাতিক সভাপতি)

সিন্ধুতাই সপকল : ভিখারিণী থেকে অনাথ শিশুদের মা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাবা-মা ছেলে চেয়েছিলেন। কিন্তু হলো মেয়ে। তাই জীবনের প্রথম পর্বে সিন্ধুতাই সপকল ছিলেন বাবা-মার কাছে অবাঞ্ছিত। তার ওপর, যে বয়েসে মেয়েরা পুতুল খেলে সেই বয়েসে সিন্ধুতাই-এর বিয়ে হলো চরম অত্যাচারী এক মানুষের সঙ্গে। যখন তিনি ন' মাসের অন্তঃসত্ত্বা সেই সময় তার স্বামী তাকে পরিত্যাগ করেন। এই অবস্থায় চারপাশের নির্দয় মানুষগুলোর সঙ্গে যে কোনো শর্তে সমঝোতা করে কোনোরকমে টিকে থাকার চেষ্টা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সিন্ধুতাই অন্য ধাতুতে গড়া। জীবন তাকে যতবার চ্যালেঞ্জ করেছে ততবারই তিনি কঠিন থেকে কঠিনতরো হয়েছেন। নিজে কোথাও আশ্রয় পাননি বলেই বোধহয় অকাতরে আশ্রয় দিয়েছেন। হয়ে উঠেছেন ১৪০০ পথশিশুর মা।

অনাথ বাচ্চাদের সঙ্গে সিন্ধুতাই।

এ এক দীর্ঘ পরিক্রমা! লোকে বলে সিন্ধুতাই-এর জীবনের পরোতে-পরোতে গল্প। শক্তি এবং মায়ার সহাবস্থান। নিজের এলাকায় সিন্ধুতাই-এর পরিচয় 'এতিমোঁ কি মাঈ' অর্থাৎ অনাথ পথশিশুদের মা। যখন বাচ্চাদের কথা বলেন তখন তিনি কত দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন, কত বাধার পাহাড় দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে পথ খুঁজে নিয়েছেন তা যেন ছবির মতো ফ্রেমে-ফ্রেমে উঠে আসে। আবার যখন বলেন, 'যাদের কেউ নেই তাদের পাশে আমি আছি, তখন বেঁচে থাকার এক আশ্চর্য তৃপ্তিও তার চোখে ঝকঝক করে ওঠে।

১৯৪৮ সালের ১৪ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের ওয়ারধা জেলায় পিমপ্রি মেঘে গ্রামে সিন্ধুতাই-এর জন্ম। পড়াশোনার ইচ্ছে ছিল খুব কিন্তু অভাবের ঠেলায় বেশিদূর এগোতে পারেননি। অভাবের চেহারাটা কেমন একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। বাড়িতে একটা শ্লেট কেনারও টাকা ছিল না। ভারাদি গাছের পাতায় লিখতেন সিন্ধুতাই।

স্মৃতি রোমন্থন করে তিনি বলেন, 'ছেলেবেলায় শুনতাম মেয়েরা নাকি জীবনে দু'বার চৌকাঠ পেরোয়। একবার বিয়ের পর, আর একবার মৃত্যুর পর।'

সিন্ধুতাই-এর যখন মাত্র ১০ বছর বয়স তখন ৩০ বছর বয়েসি একজন মানুষের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। স্বামী ছিলেন অত্যাচারী। অন্তঃসত্ত্বা সিন্ধুতাইকে একদিন মাঝরাতে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

লড়াই-এর সেই শুরু। ওই রাতেই তিনি গোয়ালঘরে কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। বাবা কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। সিন্ধুতাই ভেবেছিলেন মায়ের কাছে থাকবেন। কিন্তু মা তাকে আশ্রয় দেননি। এই ঘটনা সিন্ধুতাই-এর মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। আত্মহত্যা করার কথাও ভেবেছিলেন।

এই সময় থেকেই তিনি ভিক্ষাজীবী। জীবনের যাবতীয় ক্ষতচিহ্ন সময় একসময় মুছে দেয়। সিন্ধুতাই বেসামাল অবস্থা কাটিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন। অনুভব করছিলেন জীবন শুধু তাকেই দুঃখ দেয়নি। আরও অনেককে দিয়েছে। বিশেষ করে পথশিশুদের। তিনি একটি শিশুকে দত্তক নিলেন। তারপর আরও একজনকে। এদের তিনি গর্ভে ধারণ করেননি। কিন্তু গর্ভধারণের থেকে প্রতিপালনের আনন্দ কিছু কম নয়। দিন দিন তার সন্তানসংখ্যা বেড়ে চলল। বাড়তে থাকল ভিক্ষার সময়। আর তো কোনো রোজগার নেই, লোকের দেওয়া ভিক্ষেটুকুই সম্বল। বাড়িতে এতগুলো শিশু— আর তিনি, এতিমোঁ কি মাঈ। পাছে পক্ষপাত করে ফেলেন, তাই নিজের মেয়েকে রেখে এসেছেন পুনেতে। শ্রীমন্ত দাগড়ু শেঠ হালওয়াই-এর কাছে।

সেই মেয়ে নিজেই এখন একটি অনাথ আশ্রম চালান। আর সিন্ধুতাই? তার এখন ২০৭ জন জামাই, ৩৬ জন পুত্রবধূ, নাতিনাতনি প্রায় হাজার খানেক। না, এখানেই শেষ নয়।

কয়েকবছর আগে একদিন হঠাৎ এক বৃদ্ধকে দেখে সিন্ধুতাই রীতিমতো চমকে উঠেছিলেন। একদা নিজের নিষ্ঠুরতার জন্য বৃদ্ধ সেদিন অনুতপ্ত, অপরাধী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিলেন। সিন্ধুতাই তাকে ক্ষমা করেছিলেন। এমনকী আশ্রয়ও দিয়েছিলেন। তবে সন্তান হিসেবেই। এখন তিনি সকলের মা। নিজের স্বামীই বা তার ব্যতিক্রম হবেন কেন! কেউ চাইলে সস্নেহে আশি বছরের সন্তানের সঙ্গে অতিথির পরিচয় করিয়ে দেন।

মমতায় টলটল করে ওঠে তার চোখ।

কোর্টে এবং র‍্যাম্পে সমান স্বচ্ছন্দ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

টেনিস হোক কিংবা ব্যাডমিন্টন কোর্ট অথবা বিউটি প্যাজান্ট র‍্যাম্প সব জায়গাতেই সমান স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল সানিয়া মির্জা সাইনা নেওয়ালরা। টিভি এবং পত্রপত্রিকার নিয়মিত ক্যাচ কিংবা হেডলাইন যেমন হয়েছেন তেমনি র‍্যাম্পে ঝড় তুলেও বেশ কয়েকবার খবরের শিরোনামে চলে এসেছেন এই দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হায়দরাবাদি তনয়া। এদের পাশাপাশি নাম করতে হয় মহিলাদের দাবায় ভারত সেরা তানিয়া সচদেবেরও। ভারতের যে-কোনো পেশাদার সুন্দরী মডেলদের সঙ্গে এরা পাল্লা দিতে পারেন। মডেলিং ক্যাটওয়াক, র‍্যাম্প শোয়ে ভারতের ক্রীড়া সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান টেনিস আইকন সানিয়া মির্জার। টেনিসের পাশাপাশি অসামান্য স্টাইল স্টেটমেন্টের জন্যও সানিয়া সহজেই হার্টথ্রব হয়ে উঠেছেন যুব সমাজের। টেনিস কোর্টে শক্তিশালী ফোরহ্যান্ডের মতো র‍্যাম্পেও সাবলীল তিনি। লাবণ্যময়ী সানিয়া বরাবরই র‍্যাম্পের পরিচিত মুখ।

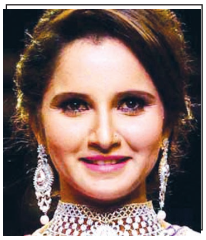

সানিয়া মির্জা

সানিয়া নেওয়াল

মেরি কম

তানিয়া সচদেব

২০১০ সাল থেকে নিয়মিত র‍্যাম্প শো করা সানিয়া ২০১২-র নভেম্বরে গ্লোবাল পিস ফ্যাশন শো-য়েও অংশ নেন। সদাহাস্যময়ী মিষ্টি মুখের আবেদন সহজেই মন এবং চোখ টানে দুনিয়া জোড়া দর্শকদের। নীতা গুপ্ত, রোহিত বল, সিসি চন্দ্রকের মতো ভারতের নামকরা ফ্যাশন ডিজাইনারদের প্রথম পছন্দ সানিয়া। ডিজাইনার শান্তনু এবং নিখিলের সঙ্গে ব্লেন্ডার্স প্রাইড ফ্যাশন শোতে তার অসাধারণ পারফরমেন্স পিছনে ফেলে দিয়েছে ভারতের সব মডেল গার্লকে। নিখুঁত ফোরহ্যান্ডে টাইমিংয়ের মতো সানিয়ার ড্রেস সেন্সও অনন্য এবং স্বকীয়। সানিয়াই প্রথম ভারতীয় খেলোয়াড় যিনি বিখ্যাত ইটালিয়ান ব্র্যান্ড 'লোটোর' সঙ্গে যুক্ত হন। তার সিগনেচার কালেকশন লোটোরই অন্তর্ভূক্ত। মুম্বই ফ্যাশন শো জগৎবিখ্যাত। একবার সেখানে শাবানা আজমির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার চ্যারিটি ফ্যাশন শো বিশেষ মাত্রা পেয়ে গেছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রের সেলিব্রিটিদের উপস্থিতিতে।

দর্শকাসন আলো করেছিলেন শিল্পপতি থেকে ফিল্মস্টার ক্রীড়াব্যক্তিত্ব সকলেই। বৃষ্টির জন্য একটু দেরিতে শুরু হওয়া শোয়ে যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটে যখন 'শো স্টপার' রূপে র‍্যাম্পে এসে দাঁড়ান একদা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বক্সার মেরিকম। এক মনমোহিনী সাজে র‍্যাম্পে অনভ্যস্ত মেরিকে দেখে কখনই মনে হয়নি, এটা তার জীবনের প্রথম ক্যাটওয়াক। 'ব্রাইট কমপ্লেকশনের' মেরিকে সেদিন অসামান্য লাগছিল মনীষ মালহোত্রার তৈরি গোলাপি গাউনে। স্ট্রেট চুলের মেরির অসাধারণ 'অ্যাকসেসরিজ' ও গোলাপি গাউনের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে গোটা হল উঠে দাঁড়িয়ে 'স্টান্ডিং অভেশন' জানায় মেরিকে। সেদিন গোটা ইভেন্টে এক নম্বর ফ্যাশন স্টপারের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন মেরিকম। চিরলড়াকু মেরিকম আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় একের পর এক কীর্তি স্থাপন করে ভারতের মেয়েদের জীবনাদর্শ হয়ে উঠেছেন।

বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে এক সময়ে এক নম্বরে ছিলেন সাইনা নেওয়াল। সাইনার সবথেকে বড় প্লাসপয়েন্ট হলো তার ডায়নামিক ফিগার আর বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ। অসাধারণ ফোটোজেনিক ফেসের অধিকারী সাইনা তাই ক্যামেরার লেন্সেরও প্রথম পছন্দ। সাইনাকে প্রথম র‍্যাম্প শোয়ে দেখা যায় ২০১০ সালে হায়দরাবাদ ফ্যাশন উইকে। জয় পূরণের তৈরি চল্লিশটি ব্রাইডাল বুটিকে যে পারফরমেন্স সেদিন তুলে ধরেছিলেন সাইনা তা যথেষ্ট ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছিল পেশাদার মডেলদের কাছে। ক্রস কোর্ট স্ম্যাশের মতোই সাইনার ড্রেসিং এবং ফ্যাশন স্টেটমেন্ট তাকে ব্যাডমিন্টন দুনিয়ায় এক নম্বর মডেল আইকন করে তুলেছে।

তানিয়া সচদেব আন্তর্জাতিক দাবা দুনিয়ায় যথেষ্ট সাড়া ফেলে শুরু করেও নিজেকে সেভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। তবে তার অসামান্য রূপ এবং ফ্যাশন শোয়ে পারদর্শিতা তাঁকে অন্যমাত্রায় উন্নীত করেছে। বুদ্ধিমত্তা এবং রূপের পারফেক্ট কম্বিনেশনে তানিয়া যে-কোনো র‍্যাম্পের বড় আকর্ষণ। ২০০৯-য়ে উইলস লাইফস্টাইল ফ্যাশন উইকের সবথেকে বড় চমক ও আবিষ্কার তানিয়া সচদেব। অনন্য ফিগারের অধিকারী উওমেন গ্রান্ডমাস্টার তানিয়া সেদিন যখন শর্ট লেংথের পোশাকে র‍্যাম্পে আসেন তখন অনাবৃত দুটি পায়ের জ্বালাময়ী আবেদনে হয়ে উঠেছিলেন সারা ভারতের একমাত্র স্টাইল আইকন। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে জন্ম ও বেড়ে ওঠা ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুনীতা রাওয়ের। টেনিস সুন্দরী সুনীতা দেশের হয়ে ফেডকাপ এবং কমনওয়েলথ গেমসেও অংশ নিয়েছেন। অসময়ে খেলা ছেড়ে পেশাদার মডেলিংয়ে চলে যান। এবং অচিরেই ঝড় তোলেন ভারত ও আমেরিকা দুদেশেই।

সন্তুষ্টিই আসল কথা

বাবা চাষের কাজ করে বলে কী ছেলেকেও তাই করতে হবে? না, ছেলে পড়াশুনা করবে, অনেক বড় হবে। এই ভেবে পটাইকে তার বাবা শহরের স্কুলে ভর্তি করে দিল। পটাই বাড়ি থেকে দশ কিলোমিটার দূরে স্কুলে পড়তে যায়। স্কুলে তার অনেক নতুন নতুন বন্ধু হলো। পটাইয়ের সবচেয়ে ভালো বন্ধু বুম্বা। বুম্বাদের বাড়ি শহরে। ওর বাবার অনেক বড় ব্যবসা। কিন্তু দুজনের খুব ভাব। একসঙ্গে খেলা, টিফিন ভাগ করে খাওয়া সব চলে। পটাই দেখে টিফিনের সময় বুম্বা ভালো ভালো খাবার নিয়ে আসে। টিফিন বক্স খুলতেই গন্ধ বেরোয়। ও যে জামা কাপড় পরে আসে সেগুলোও খুব ভালো।

একদিন রাতের বেলা বাড়িতে বাবার সঙ্গে গল্প করতে করতে পটাই বাবাকে বলল— বাবা, আমরা কত কাজ করি, তুমি সারাদিন মাঠে কাজ কর তবু কেন আমরা বুম্বাদের মত নই? ও রোজ স্কুলে নতুন নতুন টিফিন নিয়ে আসে, ওর জামাগুলোও বেশ সুন্দর!

বাবা তখন বলল— খাবার ভালো হলেই কী আর সেগুলো ভালো বলে? শান্তি করে খেলে সব খাবার ভালো। আর পরিশ্রম করে উপার্জন করা অর্থের জামাকাপড় হলো সবচেয়ে উত্তম। সেটা যদি কম দামী হয় তবুও। পটাই বাবার কথার কিছুই বুঝতে পারলো না। এরপর আর সে কোনোদিন এই নিয়ে বাবাকে কোনো কিছু বলেনি।

পটাইয়ের স্কুল শেষ হয়ে গেছে। তারপর ওর আর কলেজে ভর্তি হওয়া হয়নি, বাবার সঙ্গে জমির কাজে লেগে পড়েছে। মাঠে চাষের কাজ সে বেশ ভালোই করে। বলাইবাহুল্য, বাবার ইচ্ছে পূরণ হলো না। এরপর পটাইয়ের বাবাও একদিন মারা গেল। এখন সংসারের সব ভার পটাইয়ের উপর। জমির কাজ, বাজারের গিয়ে শাকসব্জি বিক্রি সব পটাইকে একা করতে হয়। অনেক দিন পর একবার শহরে গিয়ে পটাইয়ের মনে হলো বন্ধু বুম্বার সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়। যেমন ভাবা তেমন কাজ। সে গিয়ে হাজির হলো বন্ধু বুম্বার বাড়িতে। বিশাল বড় বাড়ি বুম্বার। বাড়িতে ঢুকতেই বুম্বা হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো। বলল— কী এতোদিন বাদে বন্ধুর কথা মনে পড়লো।

কিন্তু বুম্বাকে দেখে পটাইয়ের চোখ কপালে। একি চেহারা হয়েছে বুম্বার! এ যেন একটি বটগাছ! দুই বন্ধুতে অনেক কথা হলো, গল্প হলো। বুম্বা বলল— এতোদিন বাদে এলি আজ থেকে যা। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, আকাশের অবস্থাও ভালো নেই। পটাই থেকেই গেল।

রাতে বুম্বার বউ পটাইকে খেতে দিল। অনেক রকমের খাবার, যেগুলো পটাই কোনোদিন দেখেনি। পাশেই বসেছিল বুম্বা। কিন্তু ওর পাতে কেবল দুখানা রুটি। ওটাই জল দিয়ে খেয়ে নিল। পটাই কিছু বুঝতে পারলো না।

এরপর রাতের শোবার পালা। পাশাপাশি দুখানা বিছানা। পটাই একটা বিছানায় শুলো। নরম গদির বিছানা। পাশের বিছানায় বুম্বা। ওর বিছানায় কেবল একটা মাদুর পাতা।

পটাই আরোও অবাক হলো। বলল— কী ব্যাপার বলতো বুম্বা? তোর তো কোনো অভাব নেই তাসত্ত্বেও তুই এতো কষ্ট করিস কেন?

বুম্বা বলল— ভাই আমি ভালো নেই। কোনোদিন তো পরিশ্রম করিনি। তাই শরীরের এই অবস্থা! ডাক্তার নরম বিছানায় শুতে মানা করে দিয়েছে। খেয়েও কোনো শান্তি নেই, যা খাই তাতেই অম্বল হয়।

পটাই ছোটবেলায় বাবার কথার সেই অর্থ কোনো বুঝতে পারেনি। আজ বুম্বাকে দেখে আবার সেই কথা মনে পড়ে গেল এবং তার অর্থও বুঝতে পারলো।

ভারতের পথে পথে

আলমোড়া

ভারতের সাতাশতম রাজ্য উত্তরাখণ্ড। রাজ্যটি মূলত পাহাড়ি। গাড়োয়াল হিমালয়ের ১৩টি পাহাড়ি জেলা নিয়ে গঠিত। অনেকে বলেন মর্ত্যভূমের স্বর্গ। আলমোড়া এমনই একটি পাহাড়ি শহর। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে কুমায়ুনের রাজা কল্যাণচাঁদ আবিষ্কার করেন আলমোড়াকে। ঘোড়ার জিনের মতো এক রিজে গড়ে ওঠে কুমায়নের এই সাংস্কৃতিক পীঠস্থান। পাইন ও দেওদারে ছাওয়া ১৬৪৬ মিটার উঁচু আলমোড়া। ত্রিশূল পর্বতমুখী আলমোড়া শহরের আয়তন প্রায় ২২ বর্গকিলোমিটার। শহরের চারপাশ ঘিরে রয়েছে পাহাড়, আর প্রতিটি পাহাড়-চূড়োয় মন্দির। হিমালয়ের নৈসর্গিক শোভাই এই শহরকে করে তুলেছে আকর্ষণীয়। এখানকার আর এক আকর্ষণ স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। আশ্রমের ৩ কিলোমিটার দূরে ব্রাইট অ্যান্ড কর্নার ভিউ পয়েন্ট থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য মোহিত করে। আর আছে কাসার বা কাত্যায়নী দেবীর গুহামন্দির। পুরাণে মেলে শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধ করতে দেবী পার্বতীর কৌশিকী রূপে এখানে আবির্ভাব। স্বামী বিবেকানন্দ এই গুহামন্দিরে এসে ধ্যানে বসেছিলেন।

এসো সংস্কৃত শিখি

স্পষ্টং ন জানামি।

সঠিক জানি না।

নিশ্চয়: নাস্তি।

নিশ্চয় নেই।

ভবান্ কুত্র আসীত্?

আপনি কোথায় ছিলেন?

ভীতি: মাস্তু।

ভয় নেই।

ভয়স্য কিমপি কারণং নাস্তি।

ভয়ের কোনো কারণ নেই।

ভালো কথা

কথামালা

আমরা এক নতুন খেলা শুরু করেছি আমাদের দেয়াল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। আমাদের পাড়ার পাঠচক্রে তিনমাস পর পর একটি দেয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেখানে নানা লেখা ছাপা হয়। কিন্তু এবার যা হলো সেটা অভিনব। সবাই মিলে কথা সাজিয়ে গল্প লেখা। সেজন্য একটি খাতা করা হয়েছে। সেই খাতাটি সবার কাছে একদিন করে থাকবে। যার কাছে থাকবে সে কিছু লিখবে। পরের জন সেখান থেকেই আবার লেখা শুরু করবে। এভাবে সবার হাত ঘুরে একটি গল্প লেখা হবে। সেই গল্পটি দেয়াল পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। আমাদের এই নতুন বিভাগের নাম দেওয়া হয়েছে কথামালা। কয়েক দিনের মধ্যেই গল্প লেখা শেষ হয়ে যাবে। তারপর তা প্রকাশিত হবে।

তনুশ্রী চৌধুরী, কলকাতা-০৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

ছাত্র আমি

অনন্ত সাহা, পঞ্চম শ্রেণী

ছাত্র আমি স্কুলে যাই
পড়া ছাড়া কাজ কিছু নাই,
খেলাধূলা বিকেলবেলা
আবার সন্ধ্যে হলে পড়াশুনা,

মা বাবা দাদা দিদিরা
পড়ার সাথে শাসন করা,
ছাত্র আমি ভালো বলে
মাঝে মাঝেই আদর জোটে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 7059591955
E-mail : swastika5915@gmail.com
মেল করা যেতে পারে।

শব্দরূপ-৮২৭ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

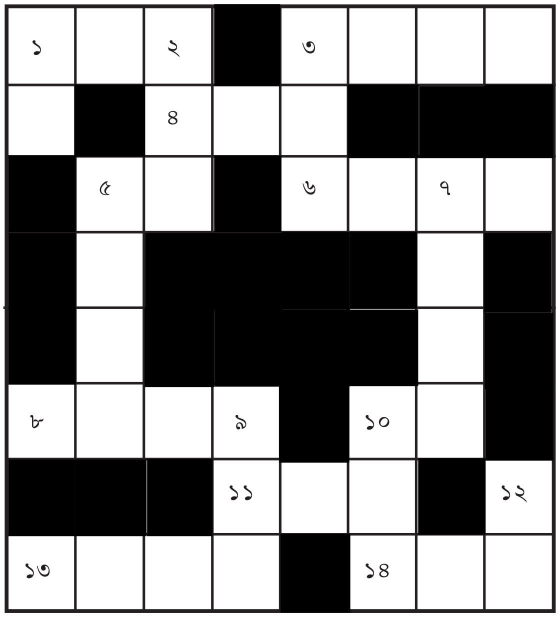

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** নীচজাতি, **৩.** শিশু, নাবালক, **৪.** বামদিকের দেহ; প্রথম দুয়ে নারী, **৫.** জলমগ্ন নিম্নভূমি, বিল, **৬.** বন্ধন করিবার পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ; বরুণের অস্ত্র, **৮.** দেবতার মূর্তিগ্রহণ ও সংসারে আগমন, **১০.** প্রেতবিশেষ যে মাটির নীচে পোঁতা ধন সামলায়, **১১.** দেবরাজ, ইন্দ্র, **১৩.** চন্দ্রবংশীয় রাজা সাঙ্কৃতির পুত্র, **১৪.** শিশুকন্যা।

উপর-নীচ : **১.** মাতা, দুর্গা; মহাভারতের কাশীরাজের প্রথমা কন্যা, **২.** সত্যকাম-জননী, **৩.** সৌষ্ঠবশালিনী নারী, **৫.** 'গীতগোবিন্দ'-র কবি, **৭.** পা ধুইবার জল, **৯.** রুদ্রবীণা, **১০.** প্রাচীন গ্রীক জাতি, ম্লেচ্ছ, **১২.** প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি।

সমাধান
শব্দরূপ-৮২৪
সঠিক উত্তরদাতা
প্রদীপ কুমার দাস
সোনামুই, হাওড়া
কেয়া মণ্ডল
কামারপুকুর, হুগলী

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৮২৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ১০ এপ্রিল ২০১৭ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ২৬

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

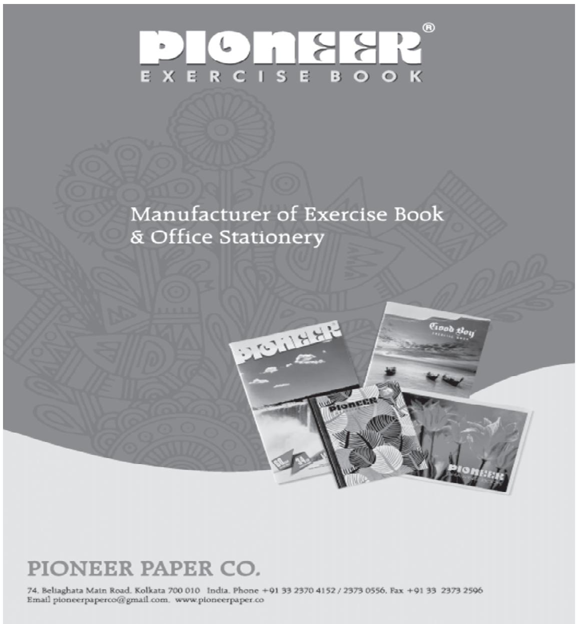

Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
ডাটা
গুঁড়ো মশলা
'থাকে যদি ডাটা,
জমে যায় রান্নাটা'
DUTA
TURMERIC
POWDER
50g
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
DUTA TURMERIC POWDER
DUTA CUMIN POWDER
DUTA Curry Powder
DUTA RED CHILLI POWDER
DUTA CORIANDER POWDER
Pure Indian Spices
fssai
Lic. No.
12812019005087
রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ২০৭ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কোলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ ঃ (০৩৩) ২২৫৯ ০৮৬৩/১৭৯৬/৪১১২/৫৫৪৮
email : dutaspice@gmail.com
website : www.dutaspices.com

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
20 March - 2017 - Rs. 10.00,

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com ।। দাম ১০ টাকা।।